

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকবুন্দেশে নির্ধারিত

---

## হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি

### রচনা

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মঙ্গল  
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক  
বিশ্ব দাশ  
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার  
ড. শিশির মলিক  
শিখা দাস

সম্পাদনা  
প্রফেসর নিরাজন অধিকারী

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২  
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪  
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্ত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূল্ক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির হিন্দু ধর্ম পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে “হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা”। এ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধান সমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দু ধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দু ধর্মসংস্কৃত সমূহে বর্ণিত কিছু জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শুগাবলি যেমন-সততা, উদারতা, কর্তব্যনির্ণয়, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভাস্তৃত্যবোধ জাগ্রত করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিরাক্ষন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের স্বরূপ	১-৯
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	১০-২৪
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস	২৫-৩৮
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	৩৯-৪৮
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৪৯-৬০
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৬১-৭১
সপ্তম	আদর্শ জীবনচরিত	৭২-৯৫
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৯৬-১১১

## প্রথম অধ্যায়

# ঈশ্বরের স্বরূপ

কত বিচি আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ। ওপরে অনন্ত আকাশ, নিচে জীবকুল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত। আমাদের পৃথিবী অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্যে ভরপুর, যেমন – খন্তুচক্রের আবর্তন, দিন-রাত্রির পালাবদল, গ্রহাণুপুঁজের আপন কক্ষপথে নিয়মতাত্ত্বিকভাবে আবর্তিত হওয়া প্রভৃতি। অনন্ত আকাশে চন্দ্র, সূর্যসহ অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র রয়েছে। এ-সকল গ্রহ, নক্ষত্র ও উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূরছে। সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না। সবকিছুই একটি গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলছে। এ সবকিছুর কারণ ঈশ্বর এবং তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। অন্যথায় এ মহাবিশ্বের সবকিছু যথানিয়মে আবর্তিত হতো না।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, শাশ্বত বা নিত্য ও অবিনশ্বর।

এ-বিশ্বে যা-কিছু ঘটছে তার প্রত্যেকটির পেছনেই একটি কারণ আছে। এ-কারণেরও কারণ আছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করলে অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে সৃষ্টির প্রথম কারণকে বলা হয় ঈশ্বর।



ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনিই ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ নিজ-নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করছেন। চিরশাস্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য ভক্ত ঈশ্বরের কাছে স্তুতি করেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়শেষে আমরা–

- ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় – এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান – এ ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের আত্মারূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি প্রার্থনামূলক সংস্কৃত শ্লোক ও একটি বাংলা কবিতা অর্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারব।

ফর্মা-১, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি

## পাঠ ১ : ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

ঈশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। দেব-দেবীরা তাঁরই শুণ বা শক্তির প্রতিভূতি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

শ্রেতাশ্চতুর উপনিষদে ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে –

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুচ্ছঃ  
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।  
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ  
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণক ॥ (৬/১১)



**সরলার্থ:** এক ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সকল জীবের মধ্যে প্রচলনীয় অবস্থান করছেন। তিনি সর্বব্যাপী, সকল জীবের আত্মা, সকল কাজের কর্তা এবং সকল জীবের আবাসস্থল। তিনি সকল কিছু দেখেন, সকল জীবকে চেতনা দান করেন। তিনি নিরাকার-নির্গুণ ব্রহ্ম। ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করছেন। গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ এ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে। জীব ও জড়বস্তু সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। জীব জন্মান্তর করছে, আবার আয়ুশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেহত্যাগ করছে। হিন্দুধর্মানুসারে জীবের দেহের ধ্বংস আছে, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস নেই।

পৃথিবীর সকল জীব ও জড়ের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

একজন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক না থাকলে এ মহাবিশ্বের সকল কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত হতো না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একাধিক ঈশ্বর থাকলে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূরতে পারত না। সকল জীব ও জড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকত না।

ধ্যান-ধারণা ও মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। ঈশ্বর নিরাকার। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। যেমন বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর কাজের মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। ধার্মিকতা ও সতত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করে। এর মাধ্যমে নৈতিক চিন্তাবোধ বিকশিত হয়। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, ‘সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; চন্দ, তারকা,



বিদ্যুৎ, অগ্নি ও তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না; সর্বত্র তিনিই প্রকাশিত আছেন এবং সকল কিছুই তিনি প্রকাশ করেন।' উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, 'প্রাণী ও অপ্রাণী যে-কোনো বিষয় বা পদার্থ যে-ভাবে থেকে জন্মাতে করে, মৃত্যু বা ধৰ্মসের মাধ্যমে আবার যাঁর কাছে ফিরে যায়, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।'

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি সবকিছু জানেন। তাই তিনি পুণ্যাত্মকে সুধী করেন, অপরাধীকে শান্তি দেন এবং অদৃশ্যভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সবকিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

**একক কাজ :** ঈশ্বরের একত্র সম্পর্কে শ্঵েতাশ্বতর উপনিষদের স্তোত্রটি আবৃত্তি কর।

নতুন শব্দ : শাশ্বত, অবিনশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

## পাঠ ২ : ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান ও জীবাত্মা

ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে এবং আমরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকি। যেমন— ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও ভগবান। খৰিরা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, ভগবান ও আত্মা বা জীবাত্মারূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা খৰিদের বর্ণনানুসারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ভগবানের পরিচয় জানব।

### ব্রহ্ম

হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল জীব ও জড়ের স্রষ্টা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু ঘটছে, সবই তাঁর কারণে। নিরাকার ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য খৰিরা 'ও'-এ প্রতীকী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ। বৃহৎ-ব্রহ্ম, বা বৃহৎ বলেই তাঁর নাম ব্রহ্ম। আবার ব্রহ্মকে বলা হয়েছে— তিনি সত্য। অর্থাৎ সত্যই ব্রহ্ম। কোনো-কোনো খৰি আবার বলেছেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। আমাদের আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ। এই ব্রহ্মকেই আবার বলা হয়েছে পরমাত্মা।

### ঈশ্বর

'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ প্রত্ন। তিনি সকল জীবের সকল কাজের প্রত্নত্বকারী। ব্রহ্ম যখন জীবের ওপর প্রত্নত্ব করেন এবং জীবকুলে সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। নিরাকার ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের আনন্দের জন্য নিজেকেই নানারূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরই অবতার। তিনি যখন দুষ্টের দমন করেন এবং ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাঁকে অবতার বলে। যেমন— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, রাম প্রভৃতি।

আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার ধারণ করে, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন— শক্তির দেবী দুর্গা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

ঈশ্বর এক। বিভিন্ন অবতার বা দেব-দেবী এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। সবই এক ঈশ্বরের লীলা।

### ভগবান

ঈশ্বরকে আমরা সর্বশক্তিমান হিসেবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। সর্বশক্তিমান বা সর্বকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে আমরা তাঁকে সমীক্ষা করি। তাঁকে ঘিরে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। ভালোবাসার অপর নাম মায়া। এই মায়ার জালে সকল জীব আবক্ষ। আমাদের কোনোকিছুর অভাব ঘটলে বা আমরা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে ঈশ্বর আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। তবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, কিন্তু উপলক্ষ্মি করতে পারি। ভজের নিকট ঈশ্বর ভগবানরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ভজের কাছে ভগবান আনন্দময়। ‘ভগ’ শব্দটির অর্থ ঐশ্঵র্য বা শুণ। ঈশ্বরের ছয়টি শুণ – ঐশ্঵র্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ছয়টি ভগ বা ঐশ্বর্য আছে বলে ঈশ্বরকে ভগবান বলা হয়। ভগবান ভজের ডাকে সাড়া দেন ও লীলা করেন। সুতরাং, ঈশ্বর যখন ভজদের কৃপা করেন, তাদের দুঃখ দূর করে তাদের ঘঙ্গল করেন, তখন তাঁকে ভগবান বলা হয়।

### জীবাত্মা

আত্মা বা পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে বলা হয় জীবাত্মা। জীবাত্মারূপে তিনি মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সর্বকিছুর মধ্যেই অবস্থান করেন। তাই ঈশ্বরভক্ত যাঁরা তাঁরা সব জীবকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন। কারো প্রতি হিংসা করেন না। কারণ জীবের প্রতি হিংসা করলে ঈশ্বরকেই হিংসা করা হয়।

### পাঠ ৩ : জ্ঞানী, যোগী ও ভজের দৃষ্টিতে ঈশ্বর

জ্ঞানী, যোগী ও ভজে ঈশ্বরকে নিজ-নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপলক্ষ্মি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী জ্ঞানের দৃষ্টিতে, যোগী যোগসাধনার মধ্য দিয়ে এবং ভজে ভজ্ঞির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলক্ষ্মি করেছেন। ঈশ্বরকে যিনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে উপলক্ষ্মি করেছেন তিনিই জ্ঞানী। ধর্মপালন ও ঈশ্বরের সাম্রাজ্য লাভের জন্য গীতায় বিভিন্ন পথের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর লাভের এ-সকল পথকে যোগসাধনা বলে। যাঁরা আত্মার উপাসনা করেন এবং যোগসাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ষ হন, তাঁদের যোগী বলা হয়। আবার যাঁরা ভজ্ঞির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলক্ষ্মি করেন তাঁরা হলেন ভজ। এখন জ্ঞানী, যোগী ও ভজের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের যে-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা হলো।

### জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর

যাঁরা সকল বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করেন এবং ব্রহ্মেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বরই ব্রহ্ম, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানুষের জন্য, জীবের জন্য এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভের জন্য কাজ করেন। জ্ঞানযোগে তাঁরা এসব করেন। জ্ঞান অর্থ জানা, যোগ অর্থ যুক্ত হওয়া। তাই জ্ঞানী শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার সঙ্গে যুক্ত যিনি।

জ্ঞান দুই প্রকার - বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা যথাক্রমে পরা ও অপরা নামেও পরিচিত। বিদ্যার ঘারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সর্বভূতে ইশ্বরের অঙ্গিত্ব উপলব্ধ হয়। জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং মুক্তির পথ প্রশংস্ত হয়। অবিদ্যার ঘারা জ্ঞানজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তাই ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞানী বলতে আজ্ঞা বা ব্রহ্ম সংবর্ধে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে।

### যোগীর দৃষ্টিতে ইশ্বর

ঘাঁরা একাগ্রতা সহকারে মনের অঙ্গস্থল থেকে ইশ্বরের অনুসন্ধান করেন, সকল কামনা-বাসনা দূর করতে সমর্থ হন, তাঁদের যোগী বলা হয়। এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ইশ্বরলাভ।

যোগীদের দৃষ্টিতে ইশ্বর পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই জীবাত্মারপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই যোগীর কাছে জীবও ইশ্বর। মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী শামী বিবেকানন্দ এ মহাবিশ্বের সকল কিছুকেই বহুস্মৃত ইশ্বররের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। ইশ্বর সম্পর্কে তাঁর অমর বাণী - ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ইশ্বর।’ অর্থাৎ জীবের সেবা করলেই ইশ্বরের সেবা করা হয়।



### ভক্তের দৃষ্টিতে ইশ্বর

ঘাঁরা সংসারের বিষয় ও বৈষম্যিক কর্মের মধ্যে থেকে সর্বশক্তিযান ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদের ভক্ত বলা হয়। ভক্তেরা সর্বজীবে ইশ্বরের অঙ্গিত্ব উপলব্ধি করেন এবং সেভাবেই জীবসেবার মধ্য দিয়ে ইশ্বরের সেবা করেন। ভক্তের নিকট ইশ্বর ভগবান। তিনি রসময়, আনন্দময় ও গুণময়।



কখনও কখনও ভগবান ভক্তের সেবা করেন। ভক্তের বোঝা বহন করেন। ভক্তও ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। নিজের সকল কাজকে ভগবানের কাজ হিসেবে সম্পোদন করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের মনে নিবিড় ও গভীর ভালোবাসা বিরাজ করে। শুধু তাই নয়, তাঁর সৃষ্টিকেও যাতে গভীরভাবে ভালোবাসতে পারেন সেজন্য ভক্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন।

**নতুন শব্দ:** সমর্পণ, আত্মজ্ঞান, বিষয়জ্ঞান, মহাযোগী।

#### পাঠ ৪ : ঈশ্বরের আআরপে অবস্থান

ঈশ্বর বা ব্রহ্মের আর একটি নাম পরমাত্মা। এ পরমাত্মা জীবের মধ্যে অবস্থান করেন বলেই জীবের চেতনাশক্তি আছে। এই চেতনাই জীবাত্মা। জীবাত্মার ধ্বংস নেই। কেবল দেহের ধ্বংস হয়। আর দেহের এ ধ্বংসকেই বলা হয় মৃত্যু।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবের মধ্যে আআরপে নিরাকার ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ক্রিয়াশীল থাকার বিষয়টি চমৎকারভাবে তাঁর একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। (গীতাঞ্জলি)

জীবের দেহের সীমার মধ্যে অসীম পরমাত্মা বা ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাঁর ক্রিয়াশীলতার কারণেই আমাদের জীবন এত সুন্দর, এত মধুর।

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মই ঈশ্বর, ভগবান এবং জীবাত্মা। তিনি এক এবং অবিভিন্ন।

**দলীল কাজ:** ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের একটি তালিকা তৈরি কর।

**নতুন শব্দ:** কূর্ম, ভগ, বৈরাগ্য, সর্বজ্ঞ।

#### পাঠ ৫: প্রার্থনামূলক মন্ত্র ও বাংলা কবিতা

##### ক. প্রার্থনামূলক মন্ত্র

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্রুষা

সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষ্মাম্।

মিত্রস্যাহং চক্রুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।

মিত্রস্য চক্রুষা সমীক্ষামহে॥ (শুক্রবৰ্ণবেদ-৩৬। ১৮)

**সরলার্থ:** হে ঈশ্বর, আমাকে এমন দৃঢ় কর যাতে সকল প্রাণী আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে। আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দেখি। আমরা সকলেই যেন পরম্পরকে বন্ধুর চোখে দেখি।

**ব্যাখ্যা:** শুক্রযজুর্বেদের এ-মন্ত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে—ঈশ্বর যেন আমাদের জ্ঞানে ও শক্তিতে এমন দৃঢ় করেন যাতে সকল প্রাণী আমাদের সঙ্গে বস্তুর মতো আচরণ করে। আমরাও যেন সকলের সঙ্গে বস্তুর মতো আচরণ করি। কাউকে যেন হিংসা না করি। এভাবে আমরা সকলেই যেন সকলের সঙ্গে বস্তুত্পূর্ণ আচরণ করি। এর ফলে জীবন হবে শান্তিময়। বস্তুত্বের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক—এ প্রার্থনা-মন্ত্রটির মধ্য দিয়ে সেই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

### খ. প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

অন্তর যম বিকশিত করো অন্তরতর হে—

নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে॥

জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।

মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে॥

মুক্ত করো হে সবাই সঙ্গে, মুক্ত করো হে বক্ষ।

সংঘার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার হস্ত॥

চরণপঙ্গে যম চিত, নিষ্পন্দিত করো হে।

নদিত করো, নদিত করো, নদিত করো হে॥

(গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

**ব্যাখ্যা:** কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ কবিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র, উদার ও সুন্দর মন এবং সচেতনতা, সক্রিয়তা ও নিষ্ঠীকতা প্রার্থনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিতে যেমন শৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সকল কাজেও যেন তেমন শৃঙ্খলা থাকে। আমরা যেন নির্ভয় ও নিঃসংশয়ে সকল কাজ করতে পারি এবং সকলের তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধন করতে পারি। সকল বাধাবিয়ন ছিন্ন করে আমরা সকল মঙ্গল ও সুন্দর কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। সবশেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি থাকে। ঈশ্বর যেন আমাদের মঙ্গল করেন এবং আনন্দে রাখেন।

### টীকা

**যজুর্বেদ:** হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক গ্রন্থ যজুর্বেদ। এতেও খণ্ডবেদের মতো দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে। যজুর্বেদের দুইটি অংশ—শুক্র ও কৃষ্ণ। যজুর্বেদের প্রধান বর্ণনার বিষয় যজ্ঞ ও যজ্ঞ-প্রণালী।

**শ্বেতাশ্঵তর উপনিষদ:** বারটি প্রধান উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ একটি। এ উপনিষদে আমরা কোথা থেকে জন্মেছি, কীভাবে জীবন ধারণ করছি এবং প্রশংসের পরে কোথায় থাকব এ-সকল বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এ উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**একক কাজ:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক কবিতাটির ভাবার্থ লেখ।

**নতুন শব্দ:** নিঃসংশয়, নিষ্পন্দিত, সংঘার, সক্রিয়তা, নিষ্ঠীকতা।

## অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর:**

১. এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম কারণ ..... |
২. ঈশ্বর শব্দের অর্থ ..... |
৩. ভক্তের নিকট ঈশ্বর ..... |
৪. যোগীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ..... |

**ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:**

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর যখন নিরাকার	তিনি স্বয়স্তু ।
২. ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ	ব্রহ্মেরই আনন্দ ।
৩. ব্রহ্মের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই,	সর্বশক্তিমান, সকল জীব ও বস্তুর সৃষ্টা ।
৪. আমাদের আনন্দ	ব্রহ্মারই সৃষ্টি । তখন তিনি ব্রহ্ম ।

**নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. ঈশ্বরকে এক ও অবিতীয় বলা হয়েছে কেন?
২. আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কেন?
৩. পরমাত্মা বলতে কী বোঝায়?
৪. ঈশ্বরকে অবতার বলা হয় কখন?
৫. ঈশ্বর কখন ব্রহ্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন?

**নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. ঈশ্বরকে ভগবান বলার কারণ ব্যাখ্যা কর ।
২. ঈশ্বরের আত্মারূপে অবস্থান ও স্বরূপ ব্যাখ্যা কর ।
৩. ভক্তের দ্রষ্টিতে ঈশ্বরের ধারণা ব্যাখ্যা কর ।
৪. পাঠ্য উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা প্রার্থনাটি লেখ এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা কর ।

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**

**১. যোগীর কাছে ঈশ্বর -**

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ক. ব্রহ্ম   | খ. ভগবান    |
| গ. পরমাত্মা | ঘ. পরমেশ্বর |

২. সকল জীবের মধ্যে চৈতন্যবোধ জাগ্রত করেন কে?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. ঈশ্বর  | খ. ভগবান    |
| গ. ব্রহ্ম | ঘ. পরমেশ্বর |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সজল তার বস্তুদের কাছে বলেছে সে আর কোনো পাপ কাজ করবে না। সে চায় পৃথিবীতে যেমন নিষ্পাপভাবে তার জন্ম হয়েছিল, ঠিক তেমনি বাকি জীবনটা পুণ্যার্জন করেই মৃত্যবরণ করতে।

৩. সজলের মধ্যে কোন অস্ত্রের জ্ঞান কাজ করেছে?

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| ক. যজুর্বেদ         | খ. অর্থবৰ্বেদ |
| গ. শ্রেতাখতর উপনিষদ | ঘ. কঠোপনিষদ   |

৪. সজলের উত্ত কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য -

- i. পারলৌকিক সুখ
- ii. ইহলৌকিক সুখ
- iii. আত্মিক সুখ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন:

কবিতা ও সবিতা দুই বোন। কবিতা ঈশ্বরকে জানার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করে। সংসারের কোনো কাজের প্রতি তার মনোযোগ নেই। তার চিন্তা শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে। অন্যদিকে সবিতা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। সে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি পূজা-পার্বণও করে, যাতে সবাইকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারে।

১. যজুর্বেদের কয়টি অংশ?
২. ঈশ্বর সম্পর্কিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীটি ব্যাখ্যা কর।
৩. সবিতা কোন বিদ্যা অধ্যয়ন করেছে? তোমার পঠিত ‘জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর’-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
৪. শান্ত অনুযায়ী সবিতাকে জ্ঞানী বলা যায় কি? তোমার পাঠ্যের আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর।

## ବିତୀର ଅଧ୍ୟାୟ ଧର୍ମଗ୍ରହଣ

ଯେ-ଏହେ ଧର୍ମ ଓ କଳ୍ୟାଣମୟ ଜୀବନେର କଥା ବଳା ହୁଯେହେ ତାକେ ଧର୍ମଗ୍ରହଣ ବଲେ । ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ରାମାଯଣ, ମହାଭାରତ, ପୂରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଆମାଦେର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରହଣ । ବେଦ ଆମାଦେର ଆଦି ଓ ଅଧିନ ଧର୍ମଗ୍ରହଣ । ବେଦ ଚିରକୁଳ ଓ ଶାଖତ । ‘ବେଦ’ ମାନେ ଜ୍ଞାନ । ପ୍ରାଚୀନ ଧ୍ୟାନେର ଧ୍ୟାନେ ପାଞ୍ଚମୀ ପରିବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ । ଏ ଜ୍ଞାନ ହଛେ ଜ୍ଞାନ-ଜୀବନ ଓ ତାର ଉତ୍ସ ପରମପୂର୍ବମ୍, ବ୍ରକ୍ଷ ବା ଈଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ । ବେଦକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ବ୍ରଚିତ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟକେ ବଳା ହୁଯ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ । ଆର ମହାଭାରତେର ଅଂଶବିଶେଷ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ସଂକ୍ଷେପେ ଗୀତା ହିସେବେ ପୃଥିକ ହାହେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେଇରେ । ଗୀତାଯ କର୍ମକେ ‘ଯଜ୍ଞ’ ବଳା ହୁଯେହେ । ଏଥାନେ ରହେଇ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମସ୍ତଯ ଏବଂ ବାନ୍ଧବ ଜୀବନେ ଚଲାଇ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ବୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଦେଶ ।



ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂକଷିପ୍ତ ପରିଚୟ, ଚତୁର୍ବେଦେର ବିଷୟବସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମଚରଣେ ତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାଯ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚତୁର୍ବର୍ଧ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳନ, ସାମ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ଗଠନେ ମାନ୍ୟବିକ ଗୁଣାବଳି ଏବଂ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ସଂକ୍ଷେପେ ଆଲୋଚନା କରା ହୁଯେହେ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମରା-

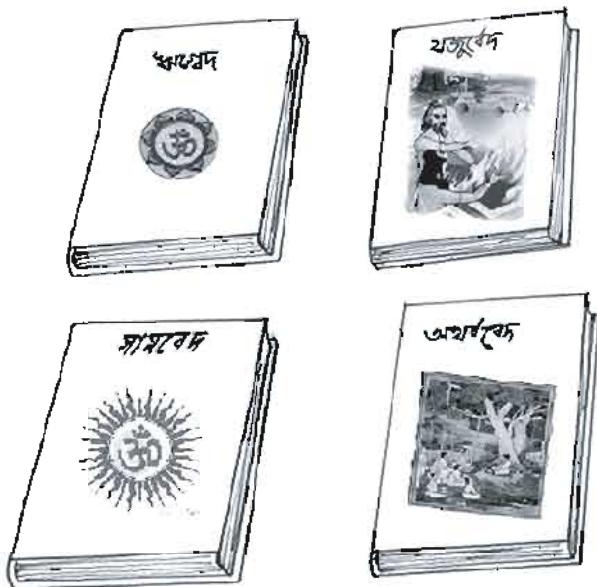
- ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂକଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦିତେ ପାଇବ
- ଚତୁର୍ବେଦେର ବିଷୟବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ ଓ ଧର୍ମଚରଣେ ତାର ଅଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତେ ପାଇବ
- ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ବର୍ଧ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳନ, ସାମ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ଗଠନେ ମାନ୍ୟବିକ ଗୁଣାବଳି ଓ ଭକ୍ତିର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାଇବ
- ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମଚରଣେ ବେଦ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟାଇ ପାଇବ ।

### পাঠ ১ : বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়

বেদ আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ। ‘বেদ’ মানে জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিমগ্ন হতে হয় গভীর সাধনার্থ। গভীর সাধনার্থ নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় ধ্যান। ধ্যান সত্য বা জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও স্থৃতির মাহাত্ম্য উপলক্ষি করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো শব্দ। বেদ এই শব্দের ধ্যানে পাণ্ডুলিপি পৰিত্র জ্ঞান। এ হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ইশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান।

আমাদের জীবন, জীবনের উৎস, পরমপুরুষ, ব্রহ্ম বা ইশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রস্তুত ভিন্ন ধরনের হলেও ধর্মীয় মানা দিক থেকে পারম্পরিকভাবে সম্পর্কিত। এভাবেই বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মতত্ত্বিক এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। একেই বলা হয় বৈদিক সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের অংশ হিসেবে যে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:



### চতুর্বেদ

বেদের এক নাম সংহিতা। সংহিতা মানে সংগ্রহ বা সংকলন। সমগ্র বেদ বা সংহিতাগুলোকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা – ১. ঋগ্বেদ-সংহিতা ২. যজুর্বেদ-সংহিতা ৩. সামবেদ-সংহিতা এবং ৪. অথর্ববেদ-সংহিতা। এ সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয় চতুর্বেদ।

### ଆକ୍ଷମ

ବେଦେର ଦୂଟି ଅଳ୍ପ – ସଜ ଓ ଆକ୍ଷମ । ବେଦେର ଯେ-ଅଳ୍ପେ ଯଜ୍ଞେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞେ କାମେର ଅରୋପ ବା ବ୍ୟବହାରେ କଥା ଆଲୋଚିତ ହେବେହେ ତାକେ 'ଆକ୍ଷମ' ବଲା ହୁଏ । ଆକ୍ଷମକୁଳୋ ମନ୍ୟ ରଚିତ । ଆକ୍ଷମେର ବିଷୟବିଜ୍ଞାନ ହଦେତ ହେବେହେ ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ-ବିଶେଷ କର୍ମ ଅନୁଭାବେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବେଦଗ୍ରେର ଅର୍ଥ ଅସମେ ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ବଢାଯାଇଛା, ବିଦୋଧୀ ଯତ୍ନେ ସମାଲୋଚନା ପଢ଼ୁଥିଲା ।

### ଆରଣ୍ୟକ

ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ ଆକ୍ଷମେର ଅଳ୍ପ । ଆକ୍ଷମେ ବେଦେର କର୍ମକାଳ ଆଲୋଚିତ ହେବେହେ, ଆର ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦେ ଜ୍ଞାନକାଳ ଆଲୋଚିତ ହେବେହେ । ଯା ଅବଶ୍ୟେ ରଚିତ ତାକେ ଆରଣ୍ୟକ ବଲେ । ଆରଣ୍ୟକେର ବିଷୟ ଧର୍ମଶର୍ମନ । କାର ଉତ୍ତରେ ସଜ, ସୃତିର ଉତ୍ସ କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏବେ ଆଲୋଚିତ ହେବେହେ । ଗତିର ଜ୍ଞାନକେ ଅରଣ୍ୟ ବା ପଞ୍ଜୀର ବନେର ସାଥେ ଫୁଲନା କରା ହେବେହେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ ଯାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ତା-ଇ ଆରଣ୍ୟକ । ଏହରେ ଆରଣ୍ୟକ, ବୃଦ୍ଧାରଣ୍ୟକ ଥର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସେଖଯୋଗ୍ୟ ଆରଣ୍ୟକ ।

### ଉପନିଷଦ

ଆରଣ୍ୟକେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବିଦ୍ୟାର ସୂଚନା, ଉପନିଷଦେ ତା ବିଭାଗ ଓ ମଞ୍ଜିରତା ଶାତ କରିବାକୁ । ଉପ-ନି-ସଦ୍ + ହିନ୍ଦୁ = ଉପନିଷଦ ।



ଏଥାନେ 'ଉପ' ଅର୍ଥ ସର୍ବାଶେ ବା ନିକଟେ, 'ନି' ଅର୍ଥ ନିକଟ, 'ସଦ୍' ଧ୍ୟାତର ଅର୍ଥ ଅବହାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ତରର ନିକଟେ ବଲେ ନିକଟେର ସମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରା ହୁଏ ତାକେ ଉପନିଷଦ ବଲେ । ବିଷ୍ଣୁ ଏ କଥାର ଉପନିଷଦେର ବିଷୟବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନା । ଜୀବେର ମୂଳୀକୃତ ସଙ୍ଗ ହେବେହେ ତାର ଆଜ୍ଞା । ଏହି ଆଜ୍ଞା ପରାମାତ୍ମା ବା ବ୍ରାହ୍ମବେହେ ଅଳ୍ପ । ସୁତ୍ରାଂ ଜୀବ ବ୍ରାହ୍ମ ହାତ୍ତା ଆମ କିମ୍ବୁଇ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ନିରାକାର । ଆଜ୍ଞାଜ୍ଞାପେ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ତୀର ଅବହାନ । କିମିହି ସବକିଛିଯ ମୁଲେ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଜାନ ଉପନିଷଦେର ବିଷୟବିଷୟ ।

উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। সেগুলোর মধ্যে ১২ খানা প্রাচীন উপনিষদ। বাকিগুলো পরবর্তীকালের। মহাভারতের অন্তর্গত হয়েও পৃথক গ্রন্থ হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষদের সার বলা হয়েছে। ঐতরেয়, কর্ত, কেন, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

একক কাজ:	চতুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
প্রকার গ্রন্থ সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখে ঘরগুলো পূরণ কর।				

### বেদাঙ্গ

বেদপাঠের সহায়ক হিসেবে আরও কয়েক রকমের রচনা রয়েছে। বেদপাঠের অঙ্গ বলে এগুলোকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ বেদপাঠের সহায়ক শাস্ত্র। বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। বেদাঙ্গগুলো সূত্রাকারে রচিত। বেদাঙ্গ হয় প্রকার, যথা – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরূপণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এই ছয়টিকে একসঙ্গে বলা হয় ষড়ঙ্গ।

১. **শিক্ষা** – ‘শিক্ষা’ শব্দটি এখানে সামগ্রিকভাবে বিদ্যার্জন বা জ্ঞানার্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ‘শিক্ষা’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব, বিশেষকরে উচ্চারণতত্ত্বসহ নির্ভুলভাবে বৈদিক শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতিকে।
২. **কল্প** – যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড যার দ্বারা কল্পিত ও সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলা হয়। ‘কল্প’ হচ্ছে নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতি।
৩. **ব্যাকরণ** – ব্যাকরণে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে সূত্রায়িত করা হয় এবং শব্দের ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় করা হয়। ভাষা ব্যবহারের সময় তার অর্থশুদ্ধির জন্য ব্যাকরণ পাঠ করা প্রয়োজন। সে কারণে ব্যাকরণও একটি বেদাঙ্গ।
৪. **নিরূপণ** – নিরূপণ নামক বেদাঙ্গে বেদে ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎপত্তি, অর্থ প্রভৃতির আলোচনা করা হয়েছে।
৫. **ছন্দ** – বেদাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে ছন্দ। বেদের যে-সকল মন্ত্র ছন্দবদ্ধ সেগুলোর অর্থবোধ এবং যথাযথ আবৃত্তির জন্য ছন্দের জ্ঞান অপরিহার্য।
৬. **জ্যোতিষ** – বৈদিক যুগে বিশেষ-বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ-বিশেষ যজ্ঞ করার ব্যবস্থা ছিল। জ্যোতিষে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যজ্ঞে ফলসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের আবশ্যক।

**একক কাজ:** বেদাঙ্গের ছয়টি অঙ্গের প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখ।

**নতুন শব্দ:** চতুর্বেদ, কল্প, নিরূপণ, ষড়ঙ্গ, জ্যোতিষ, আরণ্যক, ঐতরেয়, কর্ত, কেন, ছান্দোগ্য, প্রগাঢ়, নিমগ্ন, সংহিতা।

## ପାଠ ୨ : ଚତୁର୍ବେଦେର ବିଷୟବସ୍ତୁ

ବେଦ ଈଶ୍ୱରେର ବାଣୀ । ଖ୍ୟାମି ମନୁ ବଲେଛେ - 'ବେଦଃ ଅଧିଳଧର୍ମମୂଳମ' - ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ହଚେ ସକଳ ଧର୍ମର ମୂଳ । ଏଥାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନେର ନାନା ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖେଛେ । ଏ ସତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଅନୁଦ୍ରିଷ୍ଟି ଦିଯେ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ହୁଏ । ବେଦେ ବିଭିନ୍ନଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଦେବତାଦେର ସ୍ତ୍ରତି ବା ପ୍ରଶଂସା କରା ହେବେ । ଈଶ୍ୱରେର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକେ ଦେବତା ବଲେ । ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଉତ୍ତା, ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଈଶ୍ୱରେର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ ବୈଦିକ ଖ୍ୟାଗନ ତାଁଦେର ପ୍ରଶଂସା କରେଛେ । ତାଁଦେର ସ୍ତ୍ରତି ଓ ବନ୍ଦନା ଖ୍ୟାଦେର କଟେ କବିତାର ଆକାରେ ବାଣୀରୂପ ପେଯେଛେ । ଗଭୀର ଧ୍ୟାନେ ଏଇ ବାଣୀ ବା କବିତା ଖ୍ୟାଗନ ଈଶ୍ୱରେର କାହା ଥିକେ ପେଯେଛେ । ତାଇ ଖ୍ୟାରୀ ବଲେଛେ, ତାଁରା ବେଦ ଦର୍ଶନ କରେଛେ । ଏଜନ୍ୟ ବେଦକେ ବଲା ହୁଏ ଅପୌର୍ବ୍ୟେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ କୋନୋ ପୂର୍ବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଫୁଟ ନୟ, ତା ଧ୍ୟାନେ ଦୃଷ୍ଟି ।

ବେଦେର ସଙ୍ଗେ ଦେବତାଦେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ । ବେଦେର ବିଷୟକେ ବଲା ହୁଏ ଦେବତା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵ-ସ୍ତ୍ରତିର ମାଧ୍ୟମେ ଖ୍ୟାଗନ ଦେବତାଦେର ମାହାତ୍ୟ ତୁଲେ ଧରେଛେ । ବୈଦିକ ଯୁଗେ ଉପାସନାର ପଦ୍ଧତି ଛିଲ ଯଜ୍ଞ ବା ହୋମଭିତ୍ତିକ । ତଥନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଉପାସନା କରାର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଲିତ ହେବାନି । ଖ୍ୟାଗନ ଦେବତାଦେର ଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ କରେ ମନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମେ ଉପାସନା କରତେନ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଅଜ୍ଞଲିତ କରେ ଦେବତାକେ ଆହ୍ଵାନ କରତେନ ।

ଖ୍ୟାଗନ ବୈଦିକ ଦେବତାଦେର ତିନଟି ଶ୍ରେଣିତେ ବିନ୍ୟକ୍ତ କରେଛେ, ଯଥା - ୧. ସ୍ଵର୍ଗେର ଦେବତା, ୨. ଅନ୍ତରିକ୍ଷଲୋକେର ଦେବତା ଏବଂ ୩. ପୃଥିବୀ ବା ମର୍ତ୍ତଲୋକେର ଦେବତା ।



**ସ୍ଵର୍ଗେର ଦେବତା:** ସ୍ଵର୍ଗେର ଦେବତାଦେର କ୍ଷମତାଇ ଶୁଦ୍ଧ ବୋବା ଯାଏ । ଏ ଶ୍ରେଣିର ଦେବତାରା ମର୍ତ୍ତେ ବା ପୃଥିବୀତେ ଆସେନ ନା । ତାଁରା ଅନେକ ଦୂରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏମନ ଦେବତାରା ହଲେନ ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବରଣ ପ୍ରଭୃତି ।

**ଅନ୍ତରିକ୍ଷଲୋକେର ଦେବତା:** ଅନ୍ତରିକ୍ଷଲୋକେର ଦେବତାଗଣ ସ୍ଵର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତଲୋକେର ମାଝରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ତାଁରା ମର୍ତ୍ତେ ଆସେନ, କିନ୍ତୁ ଥାକେନ ନା । ଏକପ ଦେବତାରା ହଲେନ ଇନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ରାତ୍ରି ପ୍ରମୁଖ ।

**ମର୍ତ୍ତଲୋକେର ଦେବତା:** ମର୍ତ୍ତେର ଦେବତାଦେର ଦେଖା ଯାଏ । ତାଁରା ପୃଥିବୀତେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ଏମନ ଦେବତା ହଲେନ ଅଗ୍ନି, ଅପ, ସୋମ ପ୍ରମୁଖ । ଅଗ୍ନିର ମାଧ୍ୟମେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଦେର ମର୍ତ୍ତେ ଆହ୍ଵାନ କରେ ଆନା ହୁଏ ।

ଆଶ୍ରମ ଜ୍ଞାଲିଯେ ବେଦେର ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଦେବତାକେ ଆହ୍ଵାନ ଜାନାନୋ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାକେ ବଲା ହୁଏ ଯଜ୍ଞ । ଯଜ୍ଞର ସମୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ବେଦେର ଏଇ ଶ୍ଲୋକକେ ବଲା ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର । ଏହାଠା ରଖେଛେ ଗାନ ।

বেদের কোনো-কোনো শ্লোকে সুর আরোপ করে যজ্ঞের সময় গাওয়া হতো। এগুলোকে বলা হয় সাম। সাম মানে গান। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার কথাও বেদে উল্লিখিত হয়েছে।

**দলীয় কাজ:** স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরিক্ষলোকের দেব-দেবীদের একটি তালিকা তৈরি কর।

বেদ প্রথমে অবিভক্ত আকারেই ছিল। পরবর্তীকালে মহৰ্ষি কৃষ্ণদেশায়ন বেদকে বিভক্ত করেন। এজন্য তাঁর এক নাম হয়েছে বেদব্যাস। তিনি বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। এগুলোকে বলা হয় সংহিতা। সংহিতা মানে সংগ্রহ বা সংকলন। সংহিতাগুলো হচ্ছে- ১. ঋগ্বেদ-সংহিতা, ২. যজুর্বেদ-সংহিতা, ৩. সামবেদ-সংহিতা এবং ৪. অথর্ববেদ-সংহিতা। সংহিতাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

### ঋগ্বেদ-সংহিতা

ঋক শব্দের অর্থ স্তুতি। ঋকগুলোকে মন্ত্রও বলা হয়। এই ঋক বা মন্ত্রগুলো হচ্ছে তিন বা চার পঞ্জিকার ছোট ছোট কবিতা বা শ্লোক। এক সময়ে কবিতার মতো ঋগ্বেদের এই মন্ত্রগুলো আবৃত্তি করা হতো। সমস্ত ঋগ্বেদে এ-রকম ১০,৪৭২টি ঋক বা মন্ত্র রয়েছে। একই দেবতার উদ্দেশে রচিত মন্ত্রসমূহকে একত্রে বলা হয় সূক্ত, যেমন- ইন্দ্ৰসূক্ত।

সমস্ত ঋগ্বেদকে দশটি মণ্ডলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলে কয়েকটি সূক্ত এবং প্রতিটি সূক্তে কয়েকটি ঋক রয়েছে। ঋগ্বেদে মোট ১,০২৮টি সূক্ত রয়েছে। সূক্তগুলোতে দেবতাদের স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- ইন্দ্ৰ হচ্ছেন বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। ইন্দ্ৰের প্রশংসা করে একটি ঋকে বলা হয়েছে:

**ইন্দ্ৰং বয়ং মহাধন**

**ইন্দ্ৰমৰ্ত্তে হবামহে ।**

**যুজং বৃত্তেষু বজ্জিণম্ ॥**

(ঋগ্বেদ-১ম মণ্ডল, ৭ম সূক্ত, ৫ম ঋক)

**সরলার্থ:** ইন্দ্ৰ আমাদের সহায়। শক্রদের কাছে বজ্জিণী। আমরা অনেক সম্পদের জন্য কিংবা অঙ্গ সম্পদের জন্যও ইন্দ্ৰকে আহ্বান করি।

এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্ৰ। ইন্দ্ৰকে নিজেদের সহায় এবং শক্রদের কাছে শান্তিদানকারী বজ্জি নামক অন্তর্ধানী বলে স্তুতি করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করা হয়েছে। এই ঋক মন্ত্রটির দ্রষ্টা হলেন ঋষি মধুচন্দা।

### যজুর্বেদ-সংহিতা

‘যজু�’ মানে যজ্ঞের মন্ত্র। প্রাচীনকালের খ্যাতি বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে বা আবৃত্তি করে ধর্মানুষ্ঠান বা যাগমণ্ডল করতেন। যজ্ঞ করার সময় উদ্দিষ্ট দেবতার জন্য সুনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হতো। এভাবে যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলো সংগ্রহ করে যে-বেদে সংকলন করা হয়েছে তাকে যজুর্বেদ-সংহিতা বলা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম-পদ্ধতি যজুর্বেদে সংকলিত হয়েছে। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জি বা খাতু সম্পর্কিত ধারণা। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞ করা হতো। কোনো যজ্ঞ ছিল দৈনন্দিন, কোনো যজ্ঞ ছিল সপ্তাহব্যাপী, কোনো যজ্ঞ ছিল পক্ষকালব্যাপী। আবার কোনো যজ্ঞ বর্ষব্যাপী, এমনকি দ্বাদশবর্ষব্যাপীও অনুষ্ঠিত হতো। একেক প্রকার যজ্ঞের জন্য একেক প্রকার বেদী নির্মাণ করা হতো। এই নির্মাণ-কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উত্তীর্ণ ঘটেছে।

খাত্তেদ ও সামবেদ পদ্যে রচিত। কিন্তু যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে। যজুর্বেদ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, যথা— ১. কৃষ্ণযজুর্বেদ ও ২. শুক্রযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের অপর নাম তৈত্তিখীয়-সংহিতা। শুক্রযজুর্বেদের অপর নাম বাজসনেয়ী-সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদে ৭টি কাণ্ড ও ২১৮৪টি মন্ত্র রয়েছে। আর শুক্রযজুর্বেদে রয়েছে ৪০টি অধ্যায় এবং ১৯১৫টি মন্ত্র।

### সামবেদ-সংহিতা

‘সাম’ শব্দের অর্থ গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো-কোনো খক্ বা মন্ত্র সুর করে গাওয়া হতো। এরপি মন্ত্রগুলোকে বলা হয় সাম। যে-বেদে এই সাম মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয়েছে তাকে বলা হয় সামবেদ-সংহিতা। সামবেদ থেকে প্রাচীনকালের সংগীত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। আমরা যে সুর করে গান গাই, তার অন্যতম আদি উৎস এই সামবেদ। বড়জ, খৰত প্রভৃতি স্বরের (সরগম) উৎসও সামবেদ। প্রধানত খাত্তেদের মন্ত্রগুলোকেই সুর দিয়ে গানের আকারে রূপদান করা হয়েছে। সামবেদ-সংহিতার মন্ত্রসংখ্যা ১৮১০টি। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি ছাড়া বাকিগুলো খাত্তেদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

### অথর্ববেদ-সংহিতা

বেদের চতুর্থ ভাগ হচ্ছে অথর্ববেদ। অথর্ববেদ-সংহিতা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নানা প্রকার জ্ঞানের সংগ্রহ। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম অথর্বঙ্গিরস। অথর্ব বলতে ভেষজ বিদ্যা, শান্তি, পুষ্টি প্রভৃতি মঙ্গলক্রিয়া বোঝায়। আঙ্গিরস বলতে শক্রবধ এবং বশীভূত করার উপায়, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বোঝায়। প্রাচীনকালের চিকিৎসা পদ্ধতির আদি পরিচায়ক হিসেবে অথর্ববেদ বিখ্যাত। অথর্ববেদে নানা প্রকার ব্যাধির প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আযুর্বেদ নামে পরিচিত চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি উৎস এই অথর্ববেদ। এছাড়া এই বেদে অষ্ট্রবিদ্যা ও শল্যবিদ্যারও (সার্জারি) উল্লেখ আছে।

অথর্ববেদ-সংহিতা কুড়িটি কাণ্ড, ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ৬০০০ মন্ত্র নিয়ে রচিত। অথর্ববেদ গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতে রচিত। তবে পদ্যই বেশি। ছয় ভাগের এক ভাগমাত্র গদ্যে রচিত।

একক কাজ:	ছকে প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকার বেদের দুটি করে আলোচ্য বিষয় লেখ।	ঋগ্বেদ	যজুর্বেদ	সামবেদ	অথর্ববেদ

নতুন শব্দ: অস্ত্রদৃষ্টি, অস্ত্ররিক্ষলোক, দ্রষ্ট, সূক্ত, শল্য, অথর্বাঙ্গিরস, ষড়জ, ঋষভ।

### পাঠ ৩ : ধর্মাচরণে চতুর্বেদের প্রভাব

বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুধর্মের মূলগ্রন্থও হচ্ছে বেদ। সেদিক থেকে বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্বও অসীম। এছাড়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাসের পরিচয় পেতে হলেও বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য হিসেবেও বৈদিক সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদে দেবতাদের প্রশংসা করা হয়েছে। যজুর্বেদে যজ্ঞের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বেদ সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বেদ পাঠ করলে স্মৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়।

প্রত্যেকটি বেদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন বৈদিক দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। অগ্নি, ইন্দ্ৰ, উষা, রাত্রি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের কর্মচাঞ্চল্যকে আদর্শ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

যজুর্বেদ যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ। এ-থেকে জানতে পারি সেকালে উপাসনা-পদ্ধতি কেমন ছিল।

যজুর্বেদ অনুসরণে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা জন্মে। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করা হতো। যজ্ঞের বেদী নির্মাণের কৌশল থেকেই জ্যামিতি বা ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উঙ্গুব ঘটেছে।

সামবেদ থেকে সেকালের গান ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারি। জগতের প্রাচীন গানের অন্যতম উৎস সামবেদ। সামবেদ আমাদের মননশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজে বিশ্বজ্ঞান সৃষ্টি হতে পারেনা।

অথর্ববেদ-সংহিতায় ইন্দ্ৰজাল, ব্যাধি নিরাময়, অনাবৃষ্টি রোধ, ভেষজবিদ্যা, শাস্তি ও নানাবিধ শুভকর্ম সংক্রান্ত মন্ত্রাদি ও নির্দেশনা রয়েছে। জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে ভেষজবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা-ই ভেষজ তা-ই অমৃত। আর যা অমৃত তা-ই ব্রক্ষ। এই অথর্ববেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল। এখানে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং সমগ্র বেদপাঠে পরমাত্মা, বৈদিক দেব-দেবী, যজ্ঞ, সঙ্গীত, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ের জ্ঞান সাড় করে জীবনকে সুস্থল, সুস্থ ও শারিগতি করে তোলা যায়। আর এজন্যই এ-এই আশাদের অভ্যন্তরের পাঠ করা অবশ্যকর্তব্য।

**একক কাজ:** বেদের শিক্ষা ফুঁধি কীভাবে জীবনাচরণে প্রয়োগ করবে তা ব্যাখ্যা কর।

সত্ত্বস শব্দ: কর্মচারীত্ব, বর্ষপঞ্জি, ঘৃণ্ণণ, কল্প, কল্প।

**পাঠ ৪ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু**

মহাভারতের ভীমপর্বের অন্তর্গত ২৫ থেকে ৪২ এই আঠাব্রটি অধ্যায় একত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সহকেপে শীতা নামে পরিচিত। এখানে সর্বমোট সাতশত প্রোক আছে। এজন্য এবং এক নাম সঞ্চাপ্তী।

কুরুক্ষেত্রে শুক অক্ষয় প্রাক্কালে তপস্যাল শীকৃক অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তারই নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শৃঙ্গরাত্রি ও পাতু দুই ভাই। শৃঙ্গরাত্রি বড়,

পাতু ছোট। কুরুবংশের নাম অনুসারে শৃঙ্গরাত্রির সন্তানদের বলা হয় কৌরব। কিন্তু একই বংশের হয়েও পাতুর নাম অনুসারে তাঁর সন্তানদের বলা হয় পাতুব। রাজ্য দিয়ে এই কুরু-পাতুবের মধ্যে শুক বেঁধে থাক। এ-শুকে অবং শীকৃক ফৃতীয় পাতুর অর্জুনের রথের সামরণি হয়েছিলেন। রথ যখন দুপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হচ্ছো, তখন অর্জুন প্রগতে ধ্যায় দিপকে নিকট আঞ্চলি-



অর্জুনদের দেখে শুব্দে পড়লেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে শুক করতে অনিজ্ঞ প্রকাশ করলেন। তখন তপস্যাল শীকৃক তাঁকে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি অভূতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন। সেই উপদেশবাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। উপদেশ অর্জুন হয়েও শীতাত্ম তপস্যাল বে-উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য। শীতা সকল উপনিষদের সামৰণ্য অবশ্যনে রচিত - জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমষ্টি। কেবল ধর্মযুক্ত হিসেবেই নয়, সামৰিক ওই হিসেবেও শীতা পুরুষীর অন্যতম প্রেরণ এই। শীতা হিন্দুদের একধারা নিষ্ঠাপাঠ্য এই।

শীতাপাঠ্যের কতগুলো নিয়ম আছে। প্রথমে শুককে ধ্যায় করতে হয়। তারপর ইট দেবতাকে ধ্যায় করতে হয়। এরপর বিক্রু, সরবরাতী, ব্যাস, ব্রহ্মা ও শিবকে ধ্যায় করতে হয়। অকাশের করন্তাস ও অজন্যাস করে শীতা পাঠ করতে হয়।

গীতার মাহাত্ম্য অশেষ। গীতাপাঠ শেষে যথাসন্তুষ্ট সেই মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে হয়। গীতার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হলো:

সর্বোপনিষদো গবো দোঞ্চা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোজা দুঃখং গীতামৃতং মহৎ ॥

**সরলার্থ:** সমন্ত উপনিষদ গাভীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎসস্বরূপ এবং গীতামৃত দুঃখস্বরূপ। সুধীজনেরা সেই অমৃত পান করেন।

**একক কাজ:** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু লেখ।

নতুন শব্দ: কৌরব, পাঞ্চব।

### পাঠ ৫ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্বর্ণ, কর্তব্যপালন, সাম্য ও ভক্তি চতুর্বর্ণ

ভগবান মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন। তারপরও তাঁর সৃষ্টিতে সমাজে চারটি বর্ণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রহ্মজনে জনী ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, যিনি সত্ত্বঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শাসক কিংবা যুদ্ধকারী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, যিনি রংজঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন বৈশ্য, যিনি রংজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন শূদ্র, যিনি তমঃ গুণ দ্বারা প্রভাবিত। এই যে বর্ণ বিভাজন, এটি কিন্তু জন্মভেদে নয়, কর্মভেদে। যে যে-রকম কর্ম করে তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' - অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ হবে এমনটি নয়। সত্ত্বঃগুণ-প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণের সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবে। সুতরাং বলা যায়, জাতি বা বর্ণভেদে বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।

### কর্তব্যপালন

যা-কিছু করা হয় তা-ই কর্ম। আর যে-সকল কর্ম করা আবশ্যিক তা-ই কর্তব্যকর্ম। আর কর্তব্যকর্ম করাই কর্তব্যপালন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্তব্যপালনকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর এ কর্তব্যপালন করতে হবে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কোনো প্রকার ফলের আশা না করে। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

কর্মে তব অধিকার কর্মফলে নয়,

ফল আশা ত্যাগ কর, কর্ম যেন রয়। (গীতা - ২/৪৭)

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ‘কর্ম অর্থাৎ কর্তব্যপালনই ধর্ম। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম। আসক্তিহীনভাবে যুদ্ধ কর, তাহলে সুফল পাবে। তুমি যুদ্ধ না করলে তোমার ধর্ম নষ্ট হবে। কেননা স্ব-স্ব কর্ম সম্পাদন করাই ধর্ম।’ :

**স্বধর্মপি চাবেক্ষ্য ন বিকশ্পিতুমহসি ।**

**ধর্ম্যাদি যুদ্ধাচ্ছেয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ (গীতা - ২/৩১)**

তোমার নিজের কুলগত ধর্মের দিক বিচার করলেও মৃত্যুভয়ে তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কারণ ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক আর কিছুই নয়।

সুতরাং আমাদের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম। যেমন- ‘ছাত্রাণামু অধ্যয়নং তপঃ’ – ছাত্রদের অধ্যয়ন করাই হচ্ছে তাদের তপস্যা বা কর্তব্য।

### সাম্য

সাম্য বা সমত্ব মানে সমান। সকলকে সমান দেখার নাম সাম্যচেতনা। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর সমানভাবে বিরাজমান। সুতরাং সকল জীবকে এই যে সমতার দৃষ্টিতে দেখা এবং সমতাপূর্ণ আচরণ করা এরই নাম সাম্যবোধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, সর্ববিষয়ে সকলের প্রতি যাঁর আচরণ সমতাপূর্ণ, তিনিই শ্রেষ্ঠ (৬/৯)। সমদশী সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মায় সর্বভূতকে দেখেন (৬/২৯)। এর অর্থ হলো, সমদশী সকল জীবকে নিজের মতো মনে করেন এবং নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। সুতরাং আমরাও সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে আমরা সাম্য সম্পর্কে এ-শিক্ষাই পাই।

### ভক্তি

ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলা হয়। ভক্ত ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই বলা হয় যে – ভক্তি হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যকার মিলনসেতু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে – ভক্ত কামনা-বাসনামুক্ত হবেন। তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবেন। যিনি এভাবে ভগবানে আত্মনিবেদন করেন, তাঁর অন্তরে ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিতেই মুক্তিলাভ হয়।

**একক কাজ: কর্ম, সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখ ।**

নতুন শব্দ: সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, আসক্তি, তপঃ, সাম্য, সমদর্শন।

### পাঠ ৬ : জীবনাচরণ ও চরিত্র গঠনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়। কারণ স্বয়ং ভগবানই যুগেযুগে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসেন। তিনি বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যথানমধর্মস্য তদাআনন্দ সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (গীতা - ৪/৭-৮)

অর্থাৎ যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যথান ঘটে, তখনই সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টলোকদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই।

গীতায় বলা হয়েছে – আত্মার ধৰ্মস নেই; দেহের ধৰ্মস হলে সে আবার নতুন দেহ ধারণ করে।

গীতার এই শিক্ষা আমাদের মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়।

গীতায় আরো বলা হয়েছে – ১. শ্রদ্ধাবান ও সংযমী ব্যক্তিই জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, ২. অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষ লাভ করেন, ৩. জ্ঞানী ভক্তই ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং ৪. এই বিশাল বিশ্বে যা-কিছু আছে সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হওয়ার প্রেরণা পাই। ধর্ম অনুশীলনের কাজে প্রবৃত্ত হই, অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে ঐশ্঵রিক তত্ত্বের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করি। সবকিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত। সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি দূর করে সকলকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। যে যে-ভাবে বা যে-পথে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় ডাকতে পারে। ঈশ্বর সে-ভাবেই তার ডাকে সাড়া দেন। এটাই হচ্ছে সর্বধর্ম-সমস্বয়ের মর্মবাণী।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করা হয়েছে। জ্ঞানের আলোকে মনকে আলোকিত করতে হবে। তার জন্য কর্ম করতে হবে। এ কর্ম হবে নিষ্কাম। আর সমস্ত নিষ্কাম কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করতে হবে। একেই বলে ভক্তি। এ-তিনের সমন্বয়ে জীবনপথে চলতে হবে। সুতরাং গীতায় বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হবে সেই পথও দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে আমাদের জীবনাচরণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব অপরিসীম।

**একক কাজ :** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ : অভ্যথান, শ্রদ্ধাবান, সংযমী, অনাসক্ত, কর্মযোগী, মোক্ষ।

## অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর:**

১. বেদ ঋষিদের ..... পাওয়া পরিত্র জ্ঞান ।
২. সকল উপনিষদের সার ..... ।
৩. সঙ্গীতের অন্যতম আদি উৎস ..... ।
৪. মর্তলোকের দেবতা হলেন ..... ।
৫. যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম-পদ্ধতি ..... সংকলিত ।
৬. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম ..... ।

**ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:**

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বেদকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক	চতুর্বেদ ।
২. বেদাঙ্গের জ্ঞান না থাকলে	ভূমি পরিমাপ বিদ্যার উন্নত ঘটেছে ।
৩. সংহিতাগুলোকে একত্রে বলা হয়	গুণ ও কর্মগত ।
৪. যজ্ঞের বেদীনির্মাণ কৌশল থেকেই	সংকলন ।
৫. জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়	বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না । এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছে ।

২. বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বোঝায় ?
২. বেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর ।
৩. সঙ্গীত চর্চায় সামবেদ-সংহিতার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর ।
৪. যজুর্বেদ থেকে কীভাবে বর্ষপঞ্জি ও ভূমি পরিমাপ সম্পর্কে জানা যায় ?
৫. চতুর্বেদ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।

**নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. ‘বেদ অধ্যয়নে বেদাঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম’ – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর ।
২. ঋগ্বেদ-সংহিতার বিষয়বস্তু উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।

৩. ‘আমাদের প্রত্যেকের চতুর্বেদ পাঠ করা আবশ্যিক’ – উক্তিটির মূল্যায়ন কর।
৪. ‘জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের এক অপূর্ব সমষ্টয় হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ – বিশ্লেষণ কর।
৫. সাম্য ও ভক্তি সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৬. আমাদের জীবনাচরণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সংহিতা মানে –

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. গান    | খ. যজ্ঞ    |
| গ. সংগ্রহ | ঘ. সমীক্ষা |

২. বেদাঙ্গের অঙ্গ নয় কোনটি?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. কঙ্গ   | খ. অলংকার  |
| গ. শিক্ষা | ঘ. নিরুক্ত |

৩. ইন্দ্র, বায়ু প্রমুখ দেবতা পৃথিবীতে –

- i. আসেন না
- ii. অবস্থান করেন
- iii. আসেন কিন্তু থাকেন না

নিচের কোনটি সঠিক?

- |                   |
|-------------------|
| ক. i খ. ii        |
| গ. iii ঘ. i ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সীমা দীর্ঘদিন যাবৎ বাতের ব্যথায় ভুগছিল। অনেক চিকিৎসার পরও উপশম হচ্ছে না বিধায় সে জগৎপুর গ্রামের আযুর্বেদীয় চিকিৎসক জিতেনবাবুর শরণাপন্ন হয় এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় ছয়মাস চিকিৎসার পর সীমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

৪. জিতেনবাবুর চিকিৎসাপদ্ধতি কোন বেদের অন্তর্গত?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ক. ঋগ্বেদ   | খ. সামবেদ   |
| গ. যজুর্বেদ | ঘ. অথর্ববেদ |

৫. ধর্ম ও জীবনাচরণে উক্ত বেদের ভূমিকা হচ্ছে -

- i. অনাবৃষ্টি রোধ
- ii. ব্যাধি নিরাময়
- iii. শান্তি ও শুভকর্মের মন্ত্রাদির নির্দেশনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**সৃজনশীল প্রশ্ন:**

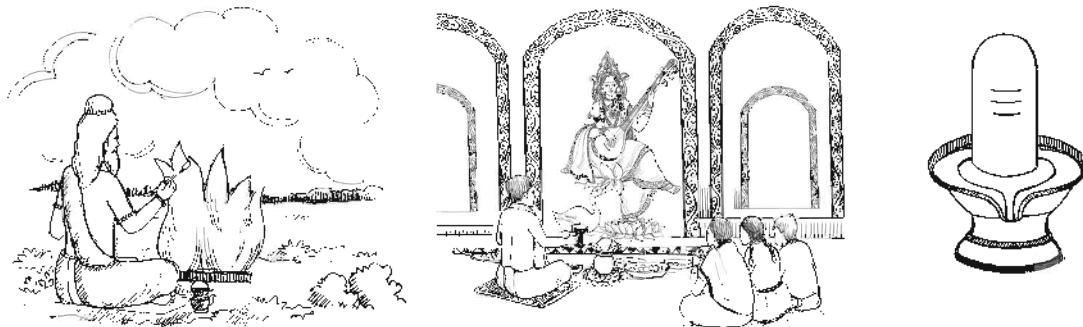
পুলিনবাবু অত্যন্ত নীতিবান ও ধার্মিক মানুষ। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে লালন-পালন করছেন। তবে ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে সুখে রাখবে একপ প্রত্যাশা তাঁর নেই। তিনি অনুভব করেন এ সংসারে নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করাই প্রকৃত ধর্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও তিনি নিজের সন্তানের মতোই গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীরাও তাঁকে পিতার ন্যায় গভীর শুন্দা করে।

- ক. গভীর সাধনায় নিমগ্ন হওয়াকে কী বলে?
- খ. বেদকে কেন অপৌরুষেয় বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- গ. পুলিনবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোন শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে - তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর পুলিনবাবুর পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব? তোমার উভরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

## ত্রুটীয় অধ্যায়

### হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

সংস্কৃত ধূ-ধাতুর সঙ্গে মন প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ যা ধারণশক্তি-সম্পন্ন তা-ই ধর্ম। হিংসা না-করা, চুরি না-করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, দেহ-মনে পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া – এ পাঁচটি গুণ হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ। আবার ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে পবিত্র বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সম্বৰ্জিদের আচার-আচরণ এবং বিবেকের নির্দেশ – এই চারটি হচ্ছে হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণ। বহু যুগের বহু সাধকের সাধনায় এ ধর্ম ক্রমশ বিকশিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম বহুকালের প্রাচীন। চলার পথে মাঝে-মাঝে নতুন ধর্মীয় চিন্তা এতে যুক্ত হয়েছে। এ ধর্মের বিধি-বিধান অনুশীলন করে জীবনকে সুস্মরণ ও শান্তিময় করা যায়।



সমাজ-জীবনে কর্ম বা জীবিকা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এ চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এ বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মাগত নয়। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকাল ধরা হয় শতবর্ষ। সমস্ত সময়টিকে চার ভাগে ভাগ করা হয় – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। একক্রমে এদের বলা হয় চতুরাশ্রম।

হিন্দুধর্মে যুগবিভাগ রয়েছে – সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রতিটি যুগের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্মের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় যুগধর্ম। পবিত্র দেহ-মন নিয়ে ধর্মচর্চা করতে হয়। এজন্য পূজা, উপবাস, প্রার্থনা, উপাসনা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের অনুশীলন করতে হয়। হিন্দুধর্মে ব্রত পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। ভক্তগণ ব্রত পালন করে পাপমুক্ত হয়ে থাকেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ ও ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ধর্মের সুফল পাওয়া যায়।

আমরা এ অধ্যায়ের দুটি পরিচেছেদের প্রথম পরিচেছে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হব। আর দ্বিতীয় পরিচেছে বর্ণ ও আশ্রমধর্মের ধারণা, বর্ণভেদ জন্মাগত নয়, পেশাগত – এ ধারণা, যুগধর্ম, ব্রতপালন, ব্রতপালনে করণীয়, শিবরাত্রির ব্রতকথা এবং ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হব।

এ অধ্যায়শেষে আমরা-

- হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারব
- জীবনাচরণে হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ ঘটাতে পারব
- বর্ণ ও আশ্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- বর্ণ ও আশ্রমধর্মের বর্ণনা করতে পারব
- বর্ণভেদ পেশাগত, জনাগত নয় – তা ব্যাখ্যা করতে পারব
- যুগধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্রতপালনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- শিবরাত্রির ব্রতকথা বর্ণনা করতে পারব
- ব্রত, ব্রতপালনে করণীয় ও ব্রতপালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বর্ণে-বর্ণে কোনো ভেদ নেই তা উপলক্ষ্মি করে নিজ আচরণে তার প্রকাশ ঘটাতে পারব
- ব্রতপালনের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে ব্রতপালনে উদ্বৃদ্ধ হব।

## প্রথম পরিচেদ

### হিন্দুধর্মের স্বরূপ

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণসমূহকে সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ – এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

#### পাঠ ১ : সাধারণ লক্ষণ

সংক্ষিত ধৃ-ধাতুর সঙ্গে মন প্রত্যয়মোগে ধর্ম শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তাহলে ধর্ম শব্দটিতে বোঝাচ্ছে ধারণশক্তি। এ-প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত ধর্মের লক্ষণটি স্মরণ করা যায়:

ধারণাদ্ব ধর্মম ইত্যাহর্থর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।

যঃ স্যাদ্ব ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিষ্ঠয়া ॥ (১০৬/১৪)

অর্থাৎ, ধারণ কিয়া (ধৃ+মন) থেকে ধর্ম শব্দের উৎপন্নি। ধর্ম সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে আছে। সংক্ষেপে যা-কিছু ধারণশক্তি-সম্পন্ন তা-ই ধর্ম। যেমন – মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে:

অহিংসা সত্যমন্তেয়ং শৌচম ইল্লিয়নিগ্রহঃ।

এতৎ সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণেত্ববীন্যানুঃ ॥ (১০/৬৩)

অর্থাৎ, হিংসা না-করা, সত্যবাদী হওয়া, চুরি না-করা, পবিত্র থাকা এবং সংযমী হওয়া – এই পাঁচটিকে চতুর্বর্ণের জন্য মনুষ্যত্ব বা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গুণগুলো অর্জন করে একজন মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে। যদি দেখা যায় একজন মানুষ অন্যকে হিংসা করেন না, জীবনে সত্যকে ধরে রেখেছেন, অপরের সম্পদ চুরি করেন না, পোশাক-পরিচেদ ও চিঞ্চা-ভাবনায় পরিশুল্ক এবং জীবন ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযমী, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী বলব। আর এরপ ব্যক্তিই হবেন হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানুষ। তাই এগুলোকে হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণ বলা হয়েছে। ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

**একক কাজঃ** ধর্মের সাধারণ লক্ষণ তোমার বাস্তব জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে তা লেখ।

নতুন শব্দঃ সংযমী, স্মরণ, মনুষ্যত্ব।

### পাঠ ২ : বিশেষ লক্ষণ

ধর্মের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনার পর ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে মনুসংহিতার বলা হয়েছে:

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ কস্য চ ত্রিয়াজ্ঞনঃ ।

এতচ্ছৃঙ্খিঃ প্রাহঃ সাক্ষাত ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ (২/১২)

অর্থাৎ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী – এই চারটি ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। এই চারটিকে অনুসরণ করে কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম তা নির্ণয় করা বাক্য।

### বেদ

সপ্তাহন ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে বেদ। বেদ আদি ধর্মাঙ্গ। ‘বেদ’ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বেদের অধিগ্নেয় ধ্যানই হয়ে ইত্যরেখ বাণী সাক্ষ করেছেন। সে-বাণীসমূহ কালক্রমে লিপিবদ্ধ হয়ে বেদ নামে পরিচিত হয়েছে। আমরা জানি বেদ চারটি – ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অর্ঘবেদ। কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম এবং মীমাংসার জন্য বেদের মতকেই প্রহৃত করা হয়।



### স্মৃতিশাস্ত্র

বেদের পরে সবব্রহ্ম কর্তৃব্যকর্মের উপদেশ দিয়ে রচিত হয় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রগুলো রচিত হয়েছে বেদের মতামত টিক রেখে। স্মৃতিশাস্ত্রের নিরূপ-নির্দেশ মেমে চলালে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করা সহজ হয়।

### সদাচার

সৎ-আচার = সদাচার। সৎ ব্যক্তিদের আচার-আচরণে ধর্মের অকাশ ঘটে। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের মাধ্যমে যদি ধর্ম ও অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে সমাজে মহাপুরুষদের আচার-আচরণ ও উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করাই ধর্ম।

### বিবেকের বাণী

পূর্বে আলোচিত বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার অনুসরণ করেও যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে ধর্ম-অধর্ম নির্ণয় করা সম্ভব না হয়, সে-ক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজস্ব বিবেকের আশ্রয় নিতে হয়। মানুষ বিবেকবান প্রাণী। তাই তাকে বিবেকবুদ্ধি অবলম্বন করে জীবনপথে চলতে হয়। সর্বক্ষেত্রে ধর্মের নির্দেশ মেলে চলা মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। যেমন – শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে সত্য বলা ধর্ম, আর মিথ্যা বলা পাপ। এ নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় মিথ্যা বললে একজন নির্দোষ মানুষের জীবন রক্ষা হয়, তাহলে সে-ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাই ধর্ম। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা ধর্ম নয়। এমন জটিল পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর বা বিবেকের নির্দেশ নিয়ে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করতে হয়।

### পাঠ ৩ : হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সনাতন তথা হিন্দুধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে। চিন্তাশীল মুনি-ধর্মিগণ মানুষের কল্যাণ চিন্তায়, ধর্মীয় আচার-আচরণে এমনকি পারমার্থিক চিন্তায় নতুন-নতুন ধর্মীয় ভাব প্রবর্তন করেছেন। বৈদিক যুগে ধর্ম-কর্ম পালিত হতো যজ্ঞকর্মরূপে। যজ্ঞক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তখন দেবতাদের আরাধনা করা হতো। যজ্ঞকর্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হতো, কিন্তু মানুষের মৃত্তিলাভ হতো না। তাই বেদের পরে উপনিষদের যুগে মুক্তির চিন্তা প্রাধান্য পায়। মানুষ মৃত্তিলাভের জন্য এক ব্রহ্মের আরাধনা করতে থাকে। এ সময় সমাজ-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। কালক্রমে এ চিন্তার মধ্যেও মানুষ যেন সম্ভষ্ট হতে পারল না। এ অবস্থায় তগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। তখন ছিল দ্বাপর যুগ। সমাজ-জীবনে সন্ন্যাসের পরিবর্তে কর্মের দিকে মোড় ফেরানো হলো। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন – কর্মত্যাগ নয়, কর্ম করতে হবে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাদ দিয়ে। মনে করতে হবে সমস্ত জগৎ তগবানের কর্মক্ষেত্র। এখানে মানুষ তগবানেরই কর্ম করে যাচ্ছে এবং কর্মের ফলও তগবানেরই প্রাপ্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়টি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মযোগ অনুশীলন করে মানুষ মৃত্তিলাভ করতে পারে।

এরপর আসে ভক্তিবাদের কথা। মানুষ ভক্তিভরে ঈশ্বরকে সাকারে উপাসনা করতে থাকে। বহু দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়। এর ফলে অবশ্য ভিন্ন-ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকগণ ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন, যেমন – শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অসহিষ্ণু ভাব দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় শ্রাচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। এ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য ভক্তির মাধ্যমে তগবানের আরাধনা করা, সমাজে বর্ণভেদ দূর করা ও শান্তি স্থাপন করা।

উনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মের অনেক আচার-আচরণে সংস্কার সাধন করা হয়। মূর্তিপূজার পরিবর্তে আসে এক ব্রহ্মচিন্তা। স্থাপিত হয় ব্রাহ্মসমাজ। অপরদিকে মূর্তিপূজার মাধ্যমেও যে মানুষ ঈশ্বরলাভ করতে পারে, এ ধারণাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মে পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটে।

সংক্ষেপে বলা যায় – হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে বৈদিক যুগে যজ্ঞকর্মে, বেদান্তের ব্রহ্মসাধনায়, পৌরাণিক যুগে দেব-দেবীর উপাসনায়, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগে, মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিভাবনায়, আর আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁর ভাব অনন্ত। তাঁকে পাওয়ার পথও বিচির। সাধনপথে যে-কোনো প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, মানবের কল্যাণের জন্যই ধর্ম এসেছে। ধর্মাচরণে মানব কল্যাণকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন, তাই মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা। এই ধর্মবোধে বিশ্বাসী হয়ে আমরা জীবনে সেবাধর্মের অনুশীলন করব এবং মানবতাবোধ জগতে যত্নবান হব।

**দলীয় কাঙ্গ:** ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ তোমাকে মানবতাবোধে কীভাবে উত্তুক করছে এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

**নতুন শব্দ:** স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার, ব্রাহ্মসমাজ, বেদান্ত।

## দ্বিতীয় পরিচেছে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

### পাঠ ১ : বর্ণভেদ

আমরা হিন্দুধর্মের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এখন বর্ণের ধারণা সম্পর্কে অবগত হব।

হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চার বর্ণের কথা বেদ থেকেই জানা যায়। সমাজে সকল মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সমান নয়। কর্মের যোগ্যতা অনুসারে প্রাচীনকাল থেকেই এ-ধর্মে বর্ণবিভাগ রয়েছে। সমাজে যাঁরা জ্ঞান-বুদ্ধিতে উন্নত তাঁরা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। তাঁরা জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ এবং ধর্মকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। আবার রাজকার্যে কুশলী, দেশরক্ষার কাজে দক্ষ – এই শ্রেণির লোকদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং শস্যাদি উৎপাদন কর্মে উৎসাহী ব্যক্তিগত হলেন বৈশ্য। আর শ্রমজীবী ব্যক্তিদের শূদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

#### বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মগত নয়

বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা ছিল কর্ম বা পেশাগত। খগ্বেদের একটি মন্ত্রে একজন খাষি বলছেন, ‘আমি বেদমন্ত্রদ্রষ্টা খাষি। আমার কন্যা যব ভেজে ছাতু বানিয়ে বিক্রি করে। আর আমার ছেলে চিকিৎসক।’ এ থেকে বোঝা যায়, তখন বর্ণভেদ জন্মগত বা বংশানুক্রমিক ছিল না। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। বৈশ্য থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ারও দ্রষ্টান্ত ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে তিনি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছেন (গীতা- ৪/১৩)। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণপ্রথা জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্রাহ্মণের সন্তান হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান হয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সন্তান হয় বৈশ্য এবং শূদ্রের সন্তান হয় শূদ্র। এজন্য একই পরিবারের চার সন্তান চার রকম গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও জন্মগত কারণে চারজনকেই একই কর্ম করতে হয়। এর ফলে তারা কোনো কর্মেই দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। তাই আধুনিক কালে হিন্দুধর্মের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন – এই বর্ণবিন্যাস হবে পূর্বের ন্যায় কর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ বর্ণভেদ পেশাগত, জন্মগত নয়। বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ প্রথা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আত্মত্বের বক্ষনের প্রতিকূল। তাই সমাজের পরিবর্তনশীলতায় এ প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের সচেতন পরিবারগুলো এ প্রথার গোড়ামির প্রতিকূলে অবস্থান নিয়ে পারিবারিক কাজ সম্পাদন করছে। পেশাগত বর্ণভেদের মূল লক্ষ্য ছিল পেশার উৎকর্ষ সাধন ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক মঙ্গল সাধন করা। বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ সমাজের সচেতন মানুষের নিকট কুসংস্কার ব্যক্তিত অন্য কিছু নয়। তাই এ দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

একক কাজ: ‘হিন্দুধর্মে বর্ণভেদ প্রথা আত্মত্বের বক্ষনের প্রতিকূল’ – এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

নতুন শব্দ: বর্ণভেদ, কুশলী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

## পাঠ ২ : আশ্রমধর্ম ও যুগধর্ম

### আশ্রমধর্ম

আশ্রমধর্ম হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ দিক। প্রাচীনকালে ঋবিগণ মানব জীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখেছেন, যেমন - ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ধ্যাস। এই চারটিকে একত্রে বলা হয় চতুরাশ্রম। মানুষের আয়ুক্ষাল মোটামুটি একশ বছর ধরে পঁচিশ বছর করে সমান চারভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পঁচিশ বছরকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এ-সময় শুরুগৃহে থেকে বিদ্যা অর্জন করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন। এ-সময় ব্রহ্মচারী শুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে বিবাহ সম্পন্ন করে সৎসারধর্ম পালন করে। পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলে সংসার ত্যাগ করে ধর্মানুশীলনের জন্য বনে যেতে হয়। এটি চলে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত। এ পর্যায়কে বলা হয় বানপ্রস্থ আশ্রম। শেষ পঁচিশ বছর হচ্ছে সন্ধ্যাস আশ্রম। এ-সময় মানুষ তৌর্তে-তৌর্তে ঘুরে বেড়ায় এবং দীক্ষারচিন্তা করে। এই চারটি স্তরে নির্ধারিত কর্মই হচ্ছে আশ্রমধর্ম।

**নতুন শব্দ:** ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ধ্যাস, চতুরাশ্রম, আয়ুক্ষাল।

### যুগধর্ম

হিন্দুধর্মের মতে যুগ হচ্ছে চারটি - সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়কে ধরা হয় সত্যযুগ। এ-যুগে মানুষ ছিল ধর্মপ্রাণ। তাদের জীবন ছিল সৎকর্ময়। তখন ধর্ম ছিল পূর্ণ, ঘোল আনা। এরপরে আসে ত্রেতাযুগ। এ-সময়ে মানবসমাজে কিছু-কিছু অসত্য এবং পাপের প্রকাশ ঘটে। তখন সমাজে ছিল একভাগ পাপ আর তিন ভাগ ধর্ম। সমাজে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাব তখনো বেশি থাকায় অধর্ম দুর্বল হয়ে থাকে।

পরবর্তী যুগকে বলা হয় দ্বাপরযুগ। এ-সময়ে ধর্মের প্রভাব আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাপ, অন্যায়, অত্যাচার বেড়ে যায়। এ-সময় ধর্ম ও অধর্ম সমান-সমান হয়ে যায়। এ-সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে সমাজের দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ, সৎ ব্যক্তিদের দুঃখ মোচন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেন।

এরপর আসে কলিযুগ। এ-সময়ে ধর্মের অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে অধর্ম তথা পাপকর্মের বৃক্ষি ঘটে। মানুষের ধর্মবোধ হারিয়ে যাওয়ার উপকরণ হয়। এ অবস্থায় আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর প্রচেষ্টায় সমাজে প্রেমভক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সমাজ-জীবনে স্বাস্থ্য ফিরে আসে।

চারযুগের আচরণের জন্য শাস্ত্রে ধর্ম-কর্মের নির্দেশ রয়েছে। তাকে বলা হয় যুগধর্ম:

তপঃ পরঃ সত্যযুগে ত্রেতায়ঃ জ্ঞানযুক্তে।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

অর্থাৎ, সত্যযুগে তপস্যা ছিল প্রধান ধর্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান।

**একক কাজ:** যুগধর্ম আনুযায়ী চার যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখে।

**নতুন শব্দ:** সৎকর্ময়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ত্রেতা, দ্বাপর।

### পাঠ ৩ : ব্রত ও ব্রতপালনে করণীয়

হিন্দুদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা, পার্বণ ও ব্রত পালনের বিধান রয়েছে। পুণ্য অর্জন ও পাপ হতে মুক্তির ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত ধর্মকর্মকেই ব্রত বলে। অর্থাৎ ব্রতপালনের উদ্দেশ্য হলো কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিশেষ কিছু আচার-বিধি পালন করা। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বিপত্তারিণী, জামাইষষ্টী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ইত্যাদি অনেক ব্রত পালন করে থাকেন।

ব্রতপালনের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মও আছে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয় এবং ব্রতের দিন ব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত উপবাস অবশ্য করণীয়। যে দিনে বা তিথিতে যে ব্রত উদ্যাপন করা হয়, সে দিনে বা তিথিতে ভক্তগণ উপবাস থেকে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে পূজা নিবেদন করেন। প্রতিটি ব্রতের ব্রতকথা আছে। ব্রত-পালনের সময় সুনির্দিষ্ট ব্রতকথা বলা বা পাঠ করা হয়। ভক্তগণ ভক্তিসহকারে সে ব্রতকথা শোনেন।

### শিবরাত্রি ব্রত

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথির রাত্রিতে শিবের আরাধনা করা হয়। শিব মঙ্গলময়। তিনি জগতের অকল্যাণ, অসুন্দর ও অন্যায় দূর করেন। তাই তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য যে-ব্রত পালন করা হয়, তাকেই ‘শিবরাত্রি ব্রত’ বলা হয়।

শিব অঞ্জলিতেই তুষ্ট হন। এজন্য তাঁর এক নাম ‘আশুতোষ’। একদিন শিব-পার্বতী একত্রে অবস্থান করছিলেন। পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি কিসে তুষ্ট হন? উত্তরে শিব বলেন, ‘কেউ উপবাসী হয়ে ভক্তিভরে একটিমাত্র বিষ্ণুপত্র দিয়েও আমার অর্চনা করলে আমি তাতেই তুষ্ট হই। বহু উপচারে আমার অর্চনা করার প্রয়োজন হয় না। হে দেবী, এই হলো আমার প্রীতিকর ব্রত। এই ব্রতের ফলস্বরূপ ভক্ত তাঁর বাসনার বস্ত্র পেয়ে থাকে। আমার অনুগ্রহ তাঁর প্রতি সর্বক্ষণ বর্ষিত হয়।’

এ-কথার অর্থ – শিব ভক্তের ভক্তি দেখেন, উপচারের বাস্তু নয়। তাই শ্রদ্ধাসহ ভক্তের সামান্য বিষ্ণুপত্রের অঞ্জলিতেই তিনি তুষ্ট হন।

শিবরাত্রি ব্রত পালনের কিছু নিয়ম রয়েছে। যেমন – শিবরাত্রির আগের দিন থেকেই ভক্ত সংযম অবলম্বন করবেন। বাক্যে, কর্মে ও চিন্তায় দেহ-মনকে পরিত্র রাখবেন। উপবাস থেকে সারাদিন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যেও শিবকে স্মরণ করবেন।

শিবরাত্রির আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে রয়েছে রাত্রির চার প্রহরে শিবকে চারবার অর্চনা করা। প্রথম প্রহরে শিবকে দুধ দিয়ে ম্লান করাতে হয়। দ্বিতীয় প্রহরে দধি দিয়ে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে। প্রতিবার ম্লানের শেষে পূজা-ধ্যান করতে হয়। এভাবে সারারাত্রি শিবের পূজায় কাটে। পরের দিন ভক্ত শিবকে পূজা দিয়ে উপবাস ভেঙ্গে পারণ করেন।

**দলীয় কাজ:** ব্রতপালনের উদ্দেশ্যসমূহ দলীয়ভাবে আলোচনা করে থাতায় লেখ।

**নতুন শব্দ:** ব্রত, বিষ্ণুপত্র, অঞ্জলি।

কর্মা-৫, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি

### পাঠ ৪ : শিবরাত্রির ব্রতকথা

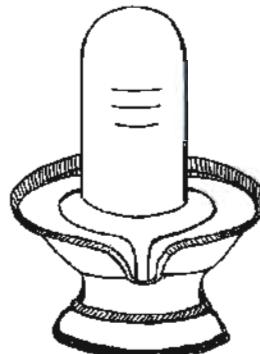
শিবরাত্রির একটি ব্রতকথা আছে। এখন সেই ব্রতকথাটি শোনা যাক:

‘শিবরহস্য’ নামক ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে – পুরাকালে বারাণসী নগরে এক ব্যাধি বাস করতেন। তাঁর খবরদেহ, কৃষ্ণকাম, পিঙ্গল চোখ ও পিঙ্গল চুল। দেখতে ভয়ঙ্কর ছিলেন সেই ব্যাধি। আবার তাঁর সঙ্গে থাকত পশু-পাখি ধরার জাল, অন্তর্শন্ত্র ইত্যাদি। বনের পশু-পাখি শিকার করে তাদের মাংস বিক্রি করাই ছিল তাঁর পেশা।

একদিন তিনি বনে গিয়ে প্রচুর পশু শিকার করলেন। তারপর মাংসের ভার বহন করে বাড়ির দিকে রওনা করলেন। বোৰা খুব ভারী ছিল। চলেও গিয়েছিলেন গভীর বনে। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তিনি বিশ্বামৈর জন্য একটি গাছের গোড়ায় শয়ে পড়লেন। দারুণ ক্লান্তিতে তিনি অতি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য অস্ত গেল। রাত নামল। চতুর্দশী তিথির অন্ধকার রাত। গভীর অন্ধকারে তিনি কি করে বাড়ি ফিরবেন। অন্ধকারে বন্যপশুরা যদি আক্রমণ করে! এসব ভেবে তিনি একটি গাছের ডালে শিকার-করা পশুর মাংস ঝুলিয়ে রাখলেন এবং নিজে চড়ে বসলেন ঐ গাছের ডালে। গাছটি ছিল বেলগাছ।

গভীর রাতে শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যাধের শরীর কাঁপতে শাগল। তখন আবার শিশির পড়ছিল। ঠাণ্ডা শিশিরে ব্যাধের কাঁপুনি গেল বেড়ে।

ঘটনাচক্রে সেই বেলগাছের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ। শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করতে হয়। শিবকে বেলপাতা দিয়ে, জল দিয়ে পূজা করতে হয়। ব্যাধ শীতে কাঁপছিলেন এবং সজোরে গাছের ডাল চেপে ধরেছিলেন। তাতে শিশিরভেজা বেলপাতা আপনা থেকেই ছিল হয়ে শিবলিঙ্গের ওপর পড়ল। এভাবেই তো ভঙ্গের জল ও বেলপাতা দিয়ে শিবচতুর্দশীর রাত্রিতে শিবের পূজা করে থাকেন। ঐ ব্যাধও জল (শিশির) ও বেলপাতা দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই শিবের পূজা করে ফেলেন। তিথিমাহাত্ম্যে ব্যাধও শিব পূজার পুণ্যফল অর্জন করলেন। কিন্তু ব্যাধ নিজে তা জানতে পারলেন না।



ব্যাধ যখন মারা গেলেন তখন যমদূতেরা চলে এলেন তাঁর আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ তিনি জীবনে যে পাপ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে নরকবাস করতে হবে। কিন্তু তৎক্ষণাত চলে এলেন শিবদূতেরা। তাঁরা তাঁকে শিবধামে নিয়ে যাবেন। তখন শিবদূত ও যমদূতদের মধ্যে বাগড়া লেগে গেল। পাপের ফলে যার যমালয়ে যাওয়ার কথা, তাঁকে শিবদূতেরা শিবধামে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু শিবদূতদের জন্য যমদূতেরা ব্যাধের কাছে ঘেঁষতে পারছেন না। তখন তাঁরা যমরাজের কাছে গিয়ে

ঘটনাটা জানালেন। যমরাজ তখন শিবধামে গিয়ে শিবের সেবক নদীর কাছে জানতে চাইলেন, একজন ঘোর পাপীকে কেন যমালয়ের পরিবর্তে শিবধামে নেওয়ার জন্য শিবদূতেরা গিয়েছেন? ঐ ব্যাধ কী এমন পুণ্য করেছেন, যার জন্য বহুপুণ্যের ফলে যে শিবধাম পাওয়া যায়, সেই শিবধামে যাওয়ার যোগ্য হলেন তিনি?

তখন নদী যমরাজকে ব্যাধের ঐ শিবপূজার কথা জানালেন। তিনি বললেন, ‘পাপীও যদি শিবরাত্রিতে যথাবিধি শিবের পূজা করে, তাহলে তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে এবং সে পুণ্যবানের ন্যায় শিবধাম প্রাপ্তির আঙ্গ হয়। এভাবেই ঐ ব্যাধের সকল পাপের বিনাশ ঘটেছে এবং সে পুণ্যবান হয়ে শিবধাম প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে।’

শিবচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা শুনে যমরাজ বিস্মিত হলেন। এভাবেই শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা কৈলাসে, দেবগোকে ও পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। তখন থেকে শিবভক্তেরা প্রতিবছর শিবরাত্রি ব্রত পালন করে আসছেন।

**নতুন শব্দ:** শিবচতুর্দশী, শ্রান্ত, ব্যাধ, পিঙ্গল।

#### পাঠ ৫ : ব্রতপালনের গুরুত্ব

হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে, ব্রতপালন করলে উদ্দিষ্ট দেবতা ব্রতীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। ‘ব্রতের মাধ্যমে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে’ – এ বিশ্বাসের জাগরণ এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্রতীর ক্রিয়াশীল হওয়া ব্রতপালনের একটি বিশেষ প্রাপ্তি।

ব্রতে আলগনা কেটেও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটানো হয়। যেমন- ধানের গোলা আঁকলে বাস্তবে প্রকৃত ধানের গোলা হবে ব্রতীর মনে এ বিশ্বাস জন্মে। সেঁজুতি ব্রতের একটি মন্ত্র হচ্ছে:

আমি দিই পিটুলির গোলা।

আমার হোক সত্যিকারের গোলা॥

লক্ষ্মীদেবীর পায়ের চিহ্ন আঁকলে সেই চিহ্নে পা ফেলে-ফেলে লক্ষ্মীদেবী নিজেই ঘরে আসবেন। ব্রতীকে ধনসম্পদ দান করবেন। ব্রতী সুখী হবেন।

অক্ষয় ত্ত্বায়ার ব্রতকথা আমাদের দানের প্রতি উৎসাহিত করে। অরণ্যঘষ্টী ব্রত পালন করলে সন্তান-সন্ততি দীর্ঘায় ও ঐশ্বর্যশালী হয়। দুর্বাটমী ব্রত পালন করলে সাতপুরুষ সুখে থাকা যায় এবং দুর্বার মতো সংজীব ও আনন্দময় হয় বৎশের সকলের জীবন।

এভাবে ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে ব্রতীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। ব্রতকে কেন্দ্র করে উপবাসের মধ্য দিয়ে দেহ ও মন সংযত হয়, পবিত্র হয়। শরীর ও মন দুই-ই ভালো থাকে।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ..... |
২. হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা ..... নয় |
৩. আমাদের জীবনে ..... কে ধরে রাখতে হবে |
৪. জটিল পরিস্থিতিতে ..... নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয় |
৫. ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র ..... বলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন |

### ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বহু সাধকের সাধনায়	ধর্ম
২. সৃষ্টিকে বিশেষভাবে ধারণ করে রয়েছে	বিকশিত হচ্ছে ধর্ম
৩. বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটি	বেদ
৪. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ	প্রাণী
৫. মানুষ বিবেকবান	ধর্মের লক্ষণ
	মহাভারত

### নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. সদাচারের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. যজ্ঞকর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
৩. কর্মযোগ বলতে কী বোঝায়?
৪. ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা কর।

### নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. হিন্দুধর্মের সাধারণ লক্ষণগুলো মেনে চলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. হিন্দুধর্মের বিশেষ লক্ষণগুলো বিশ্লেষণ কর।
৩. বর্ণপ্রথার গোঢ়ামির দিকটি বিশ্লেষণ কর।
৪. হিন্দুধর্ম বিকাশের পরিচয় দাও।
৫. শিবরাত্রি ব্রত পালনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. ‘ধর্ম’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন ধাতু থেকে?

- |       |        |
|-------|--------|
| ক. ধৃ | খ. গম  |
| গ. বদ | ঘ. দৃশ |

২. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. চারটি | খ. পাঁচটি |
| গ. আটটি  | ঘ. দশটি   |

৩. মানুষের ধর্ম হচ্ছে -

- i. মানবতা
- ii. যমতা
- iii. মনুষ্যত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**নিচের উক্তীগুলির পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**

সন্তোষবাবু শিক্ষকতা করেন। তিনি নিজে পড়েন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পড়ান।

ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিক্ষকতার আনন্দসহ  
পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি সুখে আছেন।

৪. হিন্দুধর্ম অনুসারে সন্তোষবাবু কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত?

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ক. ব্রাহ্মণ | খ. ক্ষত্ৰিয় |
| গ. বৈশ্য    | ঘ. শূদ্ৰ     |

৫. সন্তোষবাবুকে উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ -

- i. কর্ম
- ii. জন্ম
- iii. দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও iii
- গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

### সূজনশীল প্রশ্ন:

কালু চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনেকেই তাকে বোঝালেও সে এ কাজ ছাড়তে পারে না। কালু একদিন চুরি করতে গিয়ে নদীতে পড়ে হাবুড়ুরু থেতে থাকে। সজল নদীর পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় কালুকে দেখতে পায়। কালুর কাজকর্ম সম্পর্কে তার জানা থাকলেও সে কালুকে নদী থেকে টেনে তোলে।

- ক. মহাভারতের কোন পর্বে ধর্মের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে?
- খ. বেদকে সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. সজলের আচরণের মাধ্যমে ধর্মের যে বিশেষ লক্ষণটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ধর্মের সাধারণ লক্ষণ অনুযায়ী কালুর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

# নিত্যকর্ম ও যোগাসন

### নিত্যকর্ম ও যোগাসন

নিত্যকর্ম হলো পরম পবিত্র কর্ম। নিত্যকর্ম অনুশীলন করলে যোগ, তপ, সাধনা, কাজ-কর্ম, উপভোগ, আনন্দ, স্ফূর্তি সবকিছুই ভালো লাগে এবং জ্ঞানতিক ও পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয়। তাই সকলেরই নিত্যকর্মগুলো নিয়মিত করা উচিত। আর শরীরই হচ্ছে ধর্ম-কর্মের মূল আধার - ‘শরীরমূল আদ্যং  
থলু ধর্মসাধনমূল’। তাই শরীরকে নৌরোগ ও ঘনকে শান্ত রাখার জন্য সকলেরই যোগাসন অনুশীলন করা কর্তব্য। যোগাসন বহু প্রকারের। সে-সবের মধ্যে আমরা এ অধ্যায়ে গোমুখাসন, ভূজঙ্গাসন ও  
বঞ্চাসন সম্পর্কে জানব।



#### এ অধ্যায়শেষে আমরা-

- নিত্যকর্ম অনুশীলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- গোমুখাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- গোমুখাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- গোমুখাসন অনুশীলন ও এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- ভূজঙ্গাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ভূজঙ্গাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব

- ଭୂଜଙ୍ଗାସନ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାତେ ପାରିବ
- ବଜ୍ରାସନେର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ
- ବଜ୍ରାସନ ଅନୁଶୀଳନ-ପଞ୍ଚତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାତେ ପାରିବ
- ବଜ୍ରାସନ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାତେ ପାରିବ ।

### ପାଠ ୧ : ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଶୀଳନେର ପ୍ରଭାବ

ଯାରା ନିତ୍ୟକର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ କରେନ ତାଁଦେର ମନ ଥିର, ଛିର ଓ ଶାନ୍ତ ଥାକେ; ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଓ କର୍ମଠ ଥାକେ ଏବଂ ତାଁଦେର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ହୁଏ । ନିତ୍ୟକର୍ମର ଫଳେ କାଜ କରାର ଏକଟି ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଗଡ଼େ ଉଠେ । ସବ କାଜ ତାଁରା ସଠିକ ସମୟେ ସଠିକଭାବେ କରାତେ ପାରେନ । କୋଣୋ କାଜେ ତାଁଦେର ଅଳ୍ପତା ଆସେ ନା । କାଜେର ପ୍ରତି ଏକଟା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏଇ ଫଳେ କାଜଟାଓ ସେମନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ତେମନି ସକଳ କାଜେ ସଫଲତାଓ ଆସେ । କଥାମୁଖ ବଲେ - 'ସମସ୍ତରେ ଏକ କୋଡ଼, ଅସମସ୍ତରେ ଦଶ କୋଡ଼' । ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତମତୋ କୋଣୋ କାଜ ନା କରିଲେ, ଅସମୟେ ସେଇ କାଜ କରାତେ ଗେଲେ ଅନେକ ଝାମେଲା ହୁଏ ।



ନିତ୍ୟକର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ସର୍ବଦାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରା ଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭକର୍ମ କରାର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ସମୟ ନିର୍ଧାରିତ ହୁଁ ଯାଏ । ନିତ୍ୟକର୍ମକର୍ତ୍ତାଦେର ସର-ବାଡି ପରିକାର, ପରିଚନ୍ନ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଥାକେ । ଭୋରେ ଶୁମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗତେଇ ତ୍ରାଳମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କରେ ଯତ୍ନ ପାଠେର ମାଧ୍ୟମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା-ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଈଶ୍ଵରକେ ଡାକିଲେ ଆଲସ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ସମ୍ମତ ଦିନ ସୁନ୍ଦରଭାବେ କେଟେ ଯାଏ । ପ୍ରାତଃକାଳେର ଆଖ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଫଳ ଦିନେର ସେ-କୋଣୋ ସମୟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରମାର୍ଥିକ କର୍ମର ଫଳ ଥେବେ ଅନେକ ବେଶି । ପ୍ରତିଦିନ ଶୁରୁଜନକେ ନମକାର କରିଲେ ତାଁଦେର ପ୍ରତି କଥନର ଧାରାପ ବ୍ୟବହାର, ଅସମାନ ବା

অমর্থাদা করার সাহস হয় না। নমস্কার বিন্দুতার অতীক। যেখানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মানের ভাব থাকে সেখানে বিন্দুতার সৃষ্টি হয়। দেজন্য পিতা-মাতা, বিদ্যান, বর্যোবৃক্ষ ও উরুজনদের নিয়ে নমস্কার করা উচিত।



প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা যোগব্যায়াম করলে শরীর সুস্থ থাকে। সুতরাং নিমিত্ত যোগাসন করলে শরীর হট-পুষ্ট, বলবান, শক্তিশালী, ওজন্বী ও তেজবী হয় এবং সকল কাজ সুস্থভাবে করা যায়। মানুষমাঝই শাস্তির জন্য ইশ্বরের উপাসনা করে। প্রতিদিন পূজার্চনা ও উপাসনাদি দ্বারা তপগবালের নাম উচ্চারণ এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর ফলে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়। এর ফলে ইশ্বরকে লাভ করা যায়। কর্মে অনাসঙ্গ ব্যক্তির কোনো কর্মেই মন বসে না। তারা যা-কিছু করে তা বাধ্যতামূলক, সানন্দে করে না। তাই তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই উচিত নিষ্যকর্মের অনুশীলন করা।

নতুন শব্দ: ত্রাণমুক্ত, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, ওজন্বী, তেজবী, নিকর্মী, বাধ্যতামূলক।

## পাঠ ২ : গোমুখাসনের ধারণা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও প্রভাব

### গোমুখাসনের ধারণা

এই আসনে অবস্থানকালে আসন অভ্যাসকারীর পায়ের অবস্থান গরম মুখের মতো হয়। তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।



### অনুশীলন-পদ্ধতি

প্রথমে দুই পা সামনের দিকে লম্বা করে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটুতে ভেঙ্গে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি বাঁ নিতম্ব স্পর্শ করাতে হবে। বাঁ পা হাঁটুতে ভেঙ্গে বাঁ পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের পাশে স্পর্শ করাতে হবে। এবার ডান হাত মাথার ওপর তুলে কনুইতে ভেঙ্গে ঘাঢ় বরাবর পিঠের ওপর দিয়ে নিচে নামাতে হবে। বাঁ হাত কনুইতে ভেঙ্গে পেছনে পিঠের ওপর দিয়ে ওপরের দিকে নিতে হবে। এবার দু-হাতের আঙুলগুলো বড়শির মতো করে এক হাত দিয়ে অপর হাত ধরতে হবে। এ-সময় ঘাঢ় ও মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। তারপর হাতদুটো ছেড়ে, পা-দুটো আগের মতো লম্বা করে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ডানের জায়গায় বাঁ আর বাঁয়ের জায়গায় ডান করে অর্থাৎ হাত-পা বদল করে আসনটা আবার করতে হবে। এরপর ৩০ সেকেন্ড শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এ রকম চারবার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডান হাঁটু যখন বাঁ হাঁটুর ওপর থাকবে তখন ডান হাত ওপরে উঠবে। আর বাঁ হাঁটু যখন ডান হাঁটুর ওপর থাকবে তখন বাঁ হাত ওপরে উঠবে।

**একক কাজ:** গোমুখাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

### প্রভাব

গোমুখাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে –

১. পায়ের পেশি নমনীয় হয়, পায়ের ব্যথা দূর হয়।
২. হাঁটুর বাত নিরাময় হয়।
৩. পিঠের মাংসপেশির ব্যথা দূর হয়।
৪. অসমান কাঁধ সমান হয়।
৫. কাঁধের সন্ধিস্থলের ব্যথা দূর হয়।
৬. মেরুদণ্ড নমনীয় হয়, বাকা মেরুদণ্ড সোজা হয়।
৭. পরিপাক যন্ত্রের গোলযোগ ও কোষ্ঠাবন্ধতা দূর হয়।
৮. হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
৯. অনিদ্রা দূর হয়।
১০. মনের অস্ত্রিতা ও চথলতা দূর হয়, মন শান্ত থাকে।

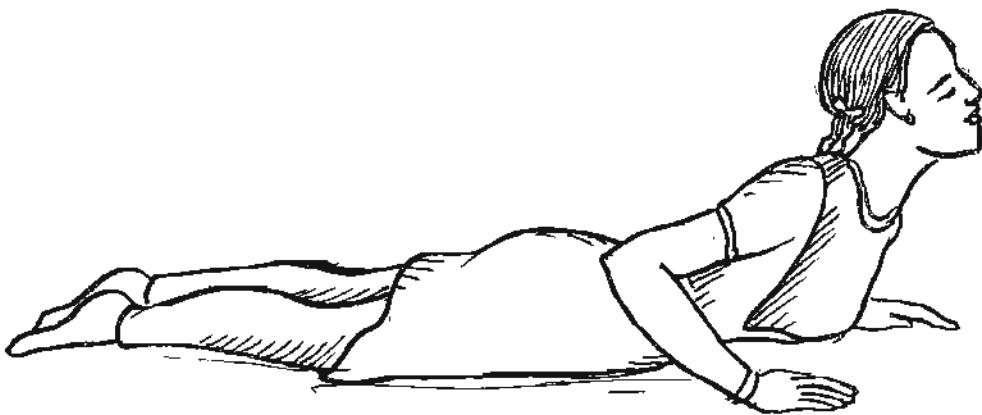
**দলীয় কাজ:** গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ:** গোমুখাসন, গোড়ালি, নিতম্ব, বাত, পেশি, পরিপাক যন্ত্র, নিরাময়, কোষ্ঠাবন্ধতা, নমনীয়, সন্ধিস্থল।

### ପାଠ ୩ : ଭୁଜঙ୍ଗାସନର ଧାରণା, ଅନୁଶୀଳନ-ପର୍ଦତି ଓ ପ୍ରଭାବ

#### ଭୁଜঙ୍ଗାସନର ଧାରণା

‘ଭୁଜଙ୍ଗ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସାପ । ଏହି ଆସନେ ଅବହାନକାଳେ କୋମର ଥିକେ ଦେହର ଉପରେ ଅଂଶକେ ଉପରେ ତୁଲିତ ହୁଏ । ଏ-ସମୟ ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସକାରୀଙ୍କେ ଫଣାତୋଳା ଭୁଜଙ୍ଗ ବା ସାପେର ମତୋ ଦେଖାଯାଇ । ତାଇ ଏ ଆସନେର ନାମ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ । ଏକେ ସର୍ବାସନଙ୍କ ବଳା ହୁଏ ।



#### ଅନୁଶୀଳନ-ପର୍ଦତି

ଶରୀରର ସମ୍ମନ ମାଂସପେଶିକେ ଶିଥିଲ କରେ ପା-ଦୂଟୋ ଜୋଡ଼ା ଓ ଲମ୍ବା କରେ ଉପ୍ଗୁଡ଼ ହୁଏ ଶୁଣେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବେ । ପାଯେର ଆଙ୍ଗୁଳଗୁଲୋ ମାଟିର ସାଥେ ଲେଗେ ଥାକିବେ । ହାତୁ, ଉର୍କ ଓ ଗୋଡ଼ାଳି ମୋଜା ଥାକିବେ । ଦୂହାତ କନ୍ଦିଯେର କାହିଁ ଥିକେ ଭେଙେ ଦୂ-ହାତେର ତାଳୁ ଉପ୍ଗୁଡ଼ କରେ ପୌଜରେର କାହେ ଦୂ-ପାଶେ ମାଟିତେ ରାଖିବାକୁ ହେବେ । ଏରପର ହାତେର ଉପର ଅଛି ଭର ଦିଯେ ଚିବୁକ ଉପରେ ତୁଳେ ଘାଡ଼ ପେଛନ ଦିକେ ନିତେ ହେବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ପା ଥିକେ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ନିଚେର ଅଂଶ ଭୂମି-ସଂଲଗ୍ନ ରେଖେ ଦେହର ଉପରେର ଅଂଶ ହାତେର ଉପର ବୈଶି ଜୋର ନା ଦିଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁକ ଓ କୋମରେର ଉପର ଜୋର ଦିଯେ ଉପରେ ତୁଲିବାକୁ ହେବେ । ଏ ଅବହାଯ ସମ୍ମନ ଶରୀର ଶିଥିଲ କରେ ୩୦ ମେନ୍‌ଟେ ଥାକିବାକୁ ହେବେ । ଏରପର ଆନ୍ତେ-ଆନ୍ତେ ପେଟ, ବୁକ, ଘାଡ଼ ଓ ଚିବୁକ ନାମିଯେ ଭୂମି-ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ହେବେ ଏବଂ ୩୦ ମେନ୍‌ଟେ ଚିଂ ହୁଏ ଶବାସନେ ବିଶ୍ରାମ ନିତେ ହେବେ । ଏଭାବେ ଏହି ଆସନ ଓ ଶବାସନ ଚାରବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବେ । ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସକାଳେ ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ସ୍ଵାଭାବିକ ଥାକିବେ ।

**ଏକକ କାଜ:** ଭୁଜଙ୍ଗାସନଟି ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଦେଖାଓ ।

### প্রভাব

ভূজঙ্গসন নিয়মিত অনুশীলন করলে –

১. মেরুদণ্ড নমনীয় হয় ।
২. বাঁকা মেরুদণ্ড সোজা ও সরল হয় ।
৩. মেরুদণ্ডের বাত সারে ।
৪. পিঠের ও কোমরের পেশি মজবুত হয়, কোমরে ব্যথা হতে পারে না ।
৫. স্নায়ুমণ্ডলী সতেজ হয় ।
৬. শরীরের নিষ্ঠেজ ভাব দূর হয় ও নতুন শক্তি জন্মায় ।
৭. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সবল হয় ।
৮. বুকের গঠন সুন্দর হয় এবং দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ।
৯. যকৃৎ ও প্রীহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, হজমশক্তি বাঢ়ে ।
১০. অজীর্ণ, অম্বল, অক্ষুধা, গ্যাস্ট্রিক, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি রোগে সুফল পাওয়া যায় ।
১১. যারা কোলকুঁজো তাদের বিশেষ উপকার হয় ।

**দলীয় কাজ:** ভূজঙ্গসন অনুশীলনে কী কী উপকার হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর ।

**নতুন শব্দ:** ভূজঙ্গ, চিবুক, পাঁজর, সংলগ্ন, নিষ্ঠেজ, লাবণ্য, কোলকুঁজো, যকৃৎ, প্রীহা, অজীর্ণ, অম্বল ।

### পার্ট ৪ : বজ্জ্বাসনের ধারণা, অনুশীলন-পদ্ধতি ও প্রভাব

#### বজ্জ্বাসনের ধারণা

যোগশান্ত্রমতে আসনটি অভ্যাসে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্জ্বের মতো কঠিন, মজবুত ও দৃঢ় হয় । তাই আসনটির নাম বজ্জ্বাসন । এটি খাওয়ার পরে করা একমাত্র আসন ।

#### অনুশীলন-পদ্ধতি

হাঁটু ভেঙ্গে পা-দুটো পেছন থেকে ঝুঁড়ে নিতম্বের নিচে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে গোড়ালি দুটো বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং দুই পায়ের গোড়ালি নিতম্বের সঙ্গে লেগে থাকে । এ অবস্থায় দু-পায়ের ঝুঁড়ো আঙুল পরস্পরের সঙ্গে



লেগে থাকবে এবং কোমর, প্রিবা ও মাথা সোজা থাকবে। দুই হাঁটু পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে। হাতের কনুই না ভেঙ্গে ডান হাত থাকবে ডান হাঁটুর ওপর, আর বাঁ হাত থাকবে বাঁ হাঁটুর ওপর। খাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ৩০ সেকেন্ড বসতে হবে। তারপর ৩০ সেকেন্ড শ্বাসনে বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে ৩/৪ বার অভ্যাস করতে হবে।

**একক কাজ:** বজ্ঞাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

### প্রভাব

বজ্ঞাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে –

১. হাঁটু ও গোড়ালির গাঁটের বাতজনিত ব্যথা দূর হয়।
২. পায়ের পেশি ও মায়ুজাল সতেজ ও সক্রিয় হয়।
৩. অক্ষুধা ও অনিদ্রা দূর হয়।
৪. মনের চক্ষুলতা দূর হয়।
৫. স্বাস্থ্য সুন্দর ও লাবণ্যময় হয়।
৬. পরিপূর্ণ আহারের পর এ আসনটি ৫ থেকে ১৫ মিনিট অভ্যাস করলে খাদ্যবস্তু সহজে হজম হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
৭. বজ্ঞাসনে বসে চুল আঁচড়ালে সহজে চুল পাকে না বা পড়ে না।

**দলীয় কাজ:** বজ্ঞাসনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ:** বজ্ঞাসন, দৃঢ়, প্রিবা, গাঁট, মায়ুজাল।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. শরীরই হচ্ছে ..... মূল আধার।
২. নমকার ..... প্রতীক।
৩. সর্পাসন বলা হয় .....।
৪. গোমুখাসনে ঘাড় আর মেরুদণ্ড ..... থাকবে।
৫. সহজে চুল পাকে না ..... বসে চুল আঁচড়ালে।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নিত্যকর্মের দ্বারা শুভকর্মানুষ্ঠানিক ফল	গরুর মুখের মতো হয়।
২. হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা থাকে	মূল আধার।
৩. গোমুখাসন অভ্যস্কারীর পায়ের অবস্থান	বজ্রাসনে।
৪. শরীরই ধর্ম সাধনের	সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়।
	ভূজঙ্গাসনে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. ‘নিত্যকর্ম অনুশীলনে জাগতিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হয়’ – কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
২. ভূজঙ্গাসন অনুশীলন-পদ্ধতির ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে লেখ।
৩. ভূজঙ্গাসন অনুশীলনে মেরণদণ্ডের ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা কর।
৪. গোমুখাসন অনুশীলনের উপকারিতা কী?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. কয়েকটি নিত্যকর্মের উল্লেখ করে এর অনুশীলনের প্রভাব বর্ণনা কর।
২. গোমুখাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩. ভূজঙ্গাসন কীভাবে অনুশীলন করতে হয়?
৪. বজ্রাসন অনুশীলন-পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫. শরীর-মনে বজ্রাসন অনুশীলনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন সময়ের আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল অনেক বেশি?
 

ক. প্রাতঃকাল	খ. পূর্বাহ্ন
গ. মধ্যাহ্ন	ঘ. অপরাহ্ন
২. যোগাসন অনুশীলনের পর বিশ্রাম নিতে হয় –
 

ক. সুখাসনে	খ. শবাসনে
গ. ভদ্রাসনে	ঘ. বীরাসনে

৩. গোমুখাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে -

- i. হাঁটুর বাত নিরাময় হয়
- ii. মেরুদণ্ড শক্ত হয়
- iii. পরিপাক ঘন্টের গোলযোগ দূর হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii
- গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়সী লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন করে। সে উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁটু, উরু ও গোড়ালি সোজা রেখে একটি আসন অনুশীলন করে এবং এর সুফলও পায়।

৪. শ্রেয়সী কোন যোগাসনটি অনুশীলন করে?

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ক. বজ্রাসন   | খ. শ্বাসন   |
| গ. ভূজঙ্গাসন | ঘ. গোমুখাসন |

৫. উক্ত আসনটি নিয়মিত অনুশীলনের ফলে শ্রেয়সীর -

- i. দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।
- ii. হজমশক্তি বাঢ়ে।
- iii. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস সবল থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii
- গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন:**

১. মিতা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু সে নিয়মিত ক্ষুলে যায় না। শ্রেণিশক্তক কারণ জানতে চাইলে মিতা জানায় তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তার মাঝের সমস্যা হলো কোনো খাবার খাওয়ার পর তিনি উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করেন

এবং হজম করতে পারেন না। উষ্ণধ খাচ্ছেন কিন্তু সুফল পাচ্ছেন না। শিক্ষক সব শোনার পর মিতাকে তার মায়ের জন্য একটি যোগাসন অনুশীলন-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন। শিক্ষকের কথামতো মিতার মা উক্ত আসন অনুশীলন করে শরীর ও মনে এই আসনের সুফল উপলব্ধি করেন।

ক. নমস্কার কিসের প্রতীক?

খ. নিত্যকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক মিতাকে তার মায়ের সুস্থিতার জন্য কোন যোগাসন অনুশীলন-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিতার মায়ের শরীর ও মনের ওপর উক্ত আসন অনুশীলনের প্রভাব মূল্যায়ন কর।

২. সড়ক দুর্ঘটনায় রাতনবাবু কোমর ও পিঠে ভীষণ আঘাত পেয়ে পঙ্কু হওয়ার উপক্রম হয়। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও তাঁর মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়। তিনি সোজা হয়ে ইঁটতে পারেন না এবং কোমরের ব্যথায় কষ্ট পান। আরোগ্য লাভের আশায় তিনি পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্রে যান। চিকিৎসক তাঁকে প্রয়োজনীয় ফিজিওথেরাপি দিয়ে একটি আসন অনুশীলনের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। রাতনবাবু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আসনটি নিয়মিত অনুশীলনে সুস্থ হন। এখন তিনি শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও সুস্থ।

ক. দেহ ও মনকে নীরোগ ও শাস্ত রাখার জন্য নিয়মিত কী করা প্রয়োজন?

খ. নিত্যকর্মকে পবিত্র কর্ম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. রাতনবাবু কোন আসন অনুশীলন করে আরোগ্য লাভ করেন? উক্ত আসনের অনুশীলন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

ঘ. 'রাতনবাবু শুধু শারীরিকভাবেই সুস্থ নন, তিনি এখন মানসিকভাবেও সুস্থ' - উক্ত আসনের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটির মূল্যায়ন কর।

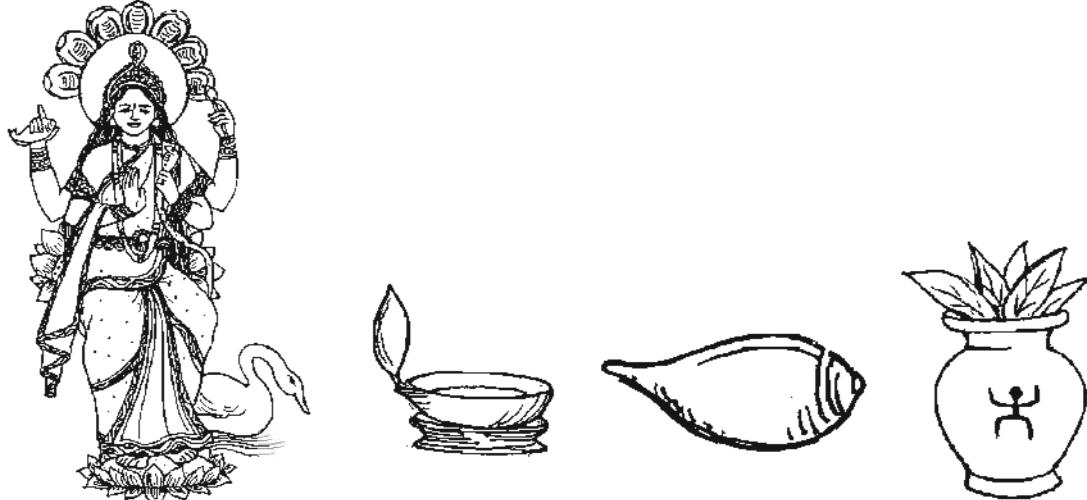
## পঞ্চম অধ্যায়

# দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ইশ্বর নিরাকার হলেও মানবকল্পাণে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

ইশ্বর যখন নিজের কোনো শুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি। ব্রহ্ম সৃষ্টির দেবতা, উগবান বিষ্ণু প্রতিপালন ও রক্ষাকারী দেবতা এবং শিব ধর্মসের দেবতা।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে আমরা তিনি প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাই— বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা ও লোকিক দেবতা।



**বৈদিক দেবতা**— যে-সকল দেবতার নাম বেদে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের বৈদিক দেবতা বলে। যেমন— অগ্নি, ইন্দ্ৰ, বিষ্ণু, উষা প্রভৃতি।

**পৌরাণিক দেবতা**— যে-সকল দেবতার নাম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলে। যেমন— দুর্গা, কালী, গণেশ প্রভৃতি।

**লোকিক দেবতা**— বেদে বা পুরাণে উল্লেখ নেই, লোকিকভাবে পূজিত হন এমন দেবতাদের বলা হয় লোকিক দেবতা। যেমন— শীতলা, মনসা, খনি প্রভৃতি।

আমরা এ-সকল দেব-দেবীর পূজা করে থাকি। দেব-দেবীর পূজা করলে ইশ্বর খুশি হন এবং তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

‘পূজা’ ও ‘পার্বণ’ শব্দদুটি আমরা সাধারণত সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু পূজা মানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। দেব-দেবীকে পুস্পপত্র, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাকে পূজা বলে। আর ‘পার্বণ’ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দানুষ্ঠান। হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। একেই বলে পার্বণ। পূজা উপলক্ষে নানারকমের আয়োজন করা হয়। পূজার জন্য নানারকম উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। যেমন- প্রতিমা নির্মাণ; দেবতার ঘর সাজানো; বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বিশেষকরে ঢাক, ডোল, ঘণ্টা, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদির আয়োজন; ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময়; কিছুটা বিচ্ছিন্ন খাওয়া-দাওয়া; বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন; পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছন্ন পরিধান ইত্যাদি।

পার্বণ পূজা অনুষ্ঠানকে অধিক আনন্দখন করে তোলে। ফলে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি, একাগ্রতা, গভীর শ্রদ্ধাবোধ, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা পূজার উপকরণ বা উপচার, এগুলো ব্যবহারের তাত্পর্য, মনসা, নারায়ণ ও শনিদেবের পরিচয়, পূজাপদ্ধতি, প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায়শেষে আমরা-

- পূজার উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপচার ব্যবহারের তাত্পর্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- মনসাদেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- মনসাপূজার প্রণামমন্ত্র বলতে, লিখতে এবং তার সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- মনসাদেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব
- নারায়ণ ও শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- নারায়ণ ও শনিদেবের প্রণামমন্ত্র বলতে, লিখতে এবং তার সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পারিবারিক জীবনে নারায়ণ ও শনি পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- মনসা, নারায়ণ ও শনি পূজার শিক্ষা উপলব্ধি করে শ্রদ্ধাভরে পূজা-অর্চনায় উদ্বৃদ্ধ হব
- প্রাকৃতিক উপচার সংরক্ষণে যত্নশীল হব
- পূজা-পার্বণের জন্য প্রাকৃতিক উপচার সংগ্রহ এবং পূজা-পার্বণের ধর্মীয় ও নান্দনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করব।

**পাঠ ১ ও ২ : পূজা-উপকরণের ধারণা এবং পূজা-উপকরণ ব্যবহারের তাৎপর্য**  
 হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়। পূজা করার বিভিন্ন রীতি-নীতি আছে, যাকে পূজাবিধি বলে।  
 বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা সঠিকভাবে করার জন্য ও পূজার রীতি-নীতিসমূহ সঠিকভাবে পালন করার জন্য  
 বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। এ-সকল পূজাসামগ্রীকে পূজার উপকরণ বা উপচার বলে।  
 উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - পূজার রীতি-নীতি বা বিধি অনুসারে অভিষ্ঠ দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্য সমর্পণ  
 করতে হয়। নৈবেদ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফল, মিঠি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়। এগুলোকেও  
 পূজার উপকরণ বা উপচার বলে।

দেব-দেবীর পছন্দ অনুসারে পূজা-উপকরণেরও ভিন্নতা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর  
 পূজা করার জন্য নিম্নবর্ণিত উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে:

১. **বিশ্ব বা প্রতিষ্ঠা:** পূজায় দেব-দেবীর বিশ্ব বা

প্রতিষ্ঠা নির্মাণ করা হয়।



২. **কলস বা ঘট:** পূজার উপকরণ হিসেবে ঘাটি বা  
 ধাতুর তৈরি একটি কলস বা ঘট ব্যবহার করা হয়।

পূজার সময় কলসটি গঙ্গা মন্দীর জল বা প্রবহমান মন্দীর পরিকার জল দিয়ে পূর্ণ করা হয়।  
 কলসকে যত্নস্থাপন করা হয়। অর্ধাং কলস বা ঘট মঙ্গলের প্রতীক। একে মা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা  
 করা হয়। কলসের মুখে আত্মপ্রস্তুত ও তার ওপর একটি সবুজ নারিকেল স্থাপন করা হয়।  
 এদের সঙ্গে সঙ্গীবতার সম্পর্ক রয়েছে। কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ পৃথিবীকে নির্দেশ করে।  
 এর কেন্দ্র জলকে নির্দেশ করে। কলসের ঘাড় অঞ্চলকে নির্দেশ করে। এবং মুখের খোলা অংশ  
 বায়ুকে নির্দেশ করে।

৩. **প্রদীপ:** পূজার একটি উপকরণ প্রদীপ। প্রদীপসৃষ্টি আলো সকল অঙ্কার  
 দূর করে বলে একে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। প্রদীপ  
 আমাদের জীবনের আলো ও আত্মাকে নির্দেশ করে।



৪. **শঙ্খ:** শঙ্খ মঙ্গলসূচক পূজা-উপকরণ, যা সৃষ্টির পবিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করে।

এর সুরেলা ধ্বনি যেন সকলকে জ্ঞানের জগতে, ভক্তির জগতে আহ্বান  
 জ্ঞানায় - তোমরা এস, দেবতার কাছে আনত হও, আত্মনিবেদন কর।



৫. **ফুলের মালা:** ফুলের মালা দেব-দেবীদের সম্মানিত ও সজ্জিত  
 করার মাজলিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬. **আসন:** আসন দেবতাদের বসার জন্য ব্যবহার করা হয়।
৭. **মুকুট:** মুকুট দেবতাদের উচ্চ সম্মানের প্রতীক।
৮. **পান-সুপারি:** পানের মধ্যে বিভিন্ন দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। সুপারির কঠিন অংশ আমাদের অহংকারের প্রতীক, যা পূজার শেষে দেবতার উদ্দেশে সমর্পণ করা হয়।
৯. **কর্পুর:** সুগঞ্জি কর্পুর পূজার পরিবেশকে বিশুদ্ধ ও মিহি করে।
১০. **গঙ্গাজল:** দেব-দেবীকে পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য পরিত্র গঙ্গার জল ব্যবহার করা হয়, কেননা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে গঙ্গার জল পরিত্র। এ-জলে বিভিন্ন ধরনের রোগ-পীড়া ভালো করার ক্ষমতা বিদ্যমান। এ ছাড়াও এ-জল আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা ও বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক।
১১. **ধূপকাঠি:** ধূপকাঠি আমাদের ইচ্ছাসমূহ নির্দেশ করে, যা দেব-দেবীর পূজার সময় বিশেষ পাত্রে রেখে প্রজ্ঞালিত করা হয়।
১২. **থালায় বিভিন্ন সামগ্রী পূজার উদ্দেশে রাখা হয়।**
১৩. **ধূপ:** ধূপ এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া সৃষ্টিকারী পূজা-উপকরণ, যা আমাদেরকে খারাপ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করে বলে বিবেচনা করা হয়।
১৪. **চন্দন:** চন্দন কাঠ সুগঞ্জি। চন্দন কাঠ জলে ঘষে অনুসেপন তৈরি করা হয়। চন্দনের গঞ্জ পরিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ কারণেই দেব-দেবীর উদ্দেশে সচন্দন পুল্প বা বিল্পত্র নিবেদন করা হয়। চন্দন একটি মঙ্গলজনক ও নান্দনিক পূজা-উপকরণ।
১৫. **আবির়:** এক ধরনের লাল রঞ্জের গুঁড়া, যা দেব-দেবীদের জন্য ব্যবহার করা হয়।
১৬. **চাল:** চাল বস্ত্রগত পূজা-উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১৭. **নৈবেদ্য:** ফুল, ফল, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি নৈবেদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়, যা দেব-দেবীর কাছে আমাদের আত্মসমর্পণকে নির্দেশ করে।
১৮. **পঞ্চারতি:** একই সাথে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্ঞালিত করা যায় এমন একটি পূজা-উপকরণ।
১৯. **ঘন্টা:** পূজায় ঘন্টা বাজানো হয়। এটি মঙ্গলজনক শব্দসৃষ্টিকারী পূজা-উপকরণ।
২০. **হলুদ:** হলুদ পরিশুদ্ধ চিন্তাকে নির্দেশ করে এবং মনকে আর্কষণ করে। এ ছাড়াও হলুদ দেবী দুর্গার প্রতীক। হলুদে ভেষজ গুণ রয়েছে।
২১. **পরিত্র সূতা:** যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হয়।

**একক কাজ:** পূজার উপচারসমূহের নাম লেখ।

**নতুন শব্দ:** সমার্থক, বিচিত্রধর্মী, সম্প্রীতি, পদ্ধতিরতি।

### পাঠ ৩ ও ৪ : মনসাদেবীর পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

#### মনসাদেবীর পরিচয়

মনসা সর্পের দেবী। তিনি সর্পকুলের জননী। তিনি আমাদের সর্পভয় থেকে রক্ষা করেন। তিনি উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেবী হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশসহ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। মনসা মূলত লৌকিক দেবী। পরে পৌরাণিক দেবীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। দেবী মনসা বিষহরি নামেও পরিচিত। কেননা তিনি সাপের বিষ হরণ করে থাকেন। ব্রহ্মার উপদেশে খৰি বশিষ্ঠ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করেন এবং তাঁর তপস্যার দ্বারা মন থেকে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব ঘটে। মন থেকে সাকার রূপ লাভ করেছেন বলে তাঁর নাম হয়েছে মনসা। পুরাণমতে তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী, আস্তিক মুনির মাতা এবং সাপের রাজা বাসুকির বোন। তাঁর পিতার নাম কশ্যপ মুনি এবং মাতার নাম কদু। তিনি নাগমাতা নামেও পরিচিত।

মনসাদেবীর চারটি হাত এবং তিনি গৌরবর্ণ। তাঁর আরেক নাম জগদ্গৌরী। চন্দের মতো সুন্দর এবং প্রসন্ন তাঁর মুখমণ্ডল। অরূপ বর্ণের অর্থাৎ ভোরের সূর্যের আলোর মতো লাল রঙের কাপড় তিনি পরিধান করেন। তিনি সোনার অলংকার পরিধান করেন। কয়েকটা সাপ তাঁকে জড়িয়ে থাকে, যেন তাঁর অলংকার। হাঁস তাঁর বাহন। প্রসন্ন মুখে তিনি হাঁসের ওপর বসে থাকেন। এ ছাড়াও আটটি সাপ তাঁর হাত, মুকুট ও পাদদেশ ধিরে থাকে।

#### মনসার পূজাপদ্ধতি

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষমী তিথিকে বলা হয় নাগপঞ্চমী। এ-সময় বাড়ির উঠানে সিজগাছ স্থাপন করে মনসাদেবীর পূজা করা হয়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষমী তিথিতেও মনসাপূজার বিধান আছে। বর্তমানে সর্বজনীনভাবে মনসাদেবীর মন্দিরে মনসাপূজা করা হয়। আবার পারিবারিক পর্যায়ে পারিবারিক মন্দিরেও মনসাদেবীর পূজা হয়।

মনসাপূজার মুখ্য উদ্দেশ্য সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। এজন্য অন্যান্য পূজার মতো সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। পূজার প্রারম্ভে সংকল্প গ্রহণ, মনসার প্রতিমা স্থাপন, আচমন, চক্ষুদান



প্রভৃতি বিধি অনুসরণ করতে হয়। এ ছাড়া মনসার ধ্যান, আবাহন মন্ত্রপাঠ এবং পূজার মন্ত্রপাঠ করতে হয়। অতঃপর স্নানমন্ত্র পাঠ করে মনসাদেবীকে স্নান করাতে হয় এবং অষ্ট নাগমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে দেবীর পূজা আরম্ভ করতে হয়। শেষে পুঁপাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্রের মাধ্যমে পূজা সমাপন করতে হয়। সবশেষে দেবী-প্রতিমাকে বিসর্জন দেয়া হয়।

### পাঠ ৫ : মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র এবং মনসাপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

#### মনসাদেবীর প্রণামমন্ত্র

আন্তিকস্য যুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা ।

জরৎকারমুনেঃ পঞ্জী মনসাদেবি নমোহস্ত তে ॥

**সরলার্থ:** আন্তিক মুনির মাতা, নাগরাজ বাসুকির ভগ্নি, জরৎকার মুনির পঞ্জী, হে মনসাদেবী! তোমাকে প্রণাম।

#### মনসাপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

মনসাদেবীর পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। সে-সকল উপাখ্যানে মনসাদেবীকে পূজা না করার ভয়াবহ পরিণাম এবং পূজা করার সুফল বর্ণিত হয়েছে। মনসাদেবীর পূজার সময় উপাখ্যানগুলো শোনানো হয়। একপ উপাখ্যান অবলম্বনে অনেক পালাগানও রচিত হয়েছে। ‘মনসার ভাসান’ এরকম একটি পালাগান। এ ছাড়াও মনসাপূজার মাধ্যমে হিন্দুধর্মবলঘীদের মধ্যে বিভিন্ন সাপ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের সুযোগ ঘটে। বিষধর সাপের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে সর্পদংশনের ঘটনা কম ঘটে। এ পূজার মূল শিক্ষা হলো সর্পকে বশীভূতকরণের কৌশল আয়ন্ত করা, যার মাধ্যমে শক্তকে সুপথে ফিরিয়ে এনে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

**একক কাজ:** মনসাদেবীর পূজার সুফলগুলো লেখ।

**নতুন শব্দ:** প্রজ্ঞলিত, জগদ্গোরী, নাগপঞ্চমী, কদু।

### পাঠ ৬ : নারায়ণদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

#### নারায়ণদেবের পরিচয়

বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে ২৪৫তম নাম নারায়ণ। হিন্দুধর্ম অনুসারে নারায়ণ পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর নামে পরিচিত। ‘নার’ বা ‘নারা’ শব্দের অর্থ মানুষ এবং ‘অয়ন’ শব্দের অর্থ আশ্রয়। সুতরাং ‘নারায়ণ’ শব্দের অর্থ সকল মানুষ বা সকল জীবের আশ্রয়স্থল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও পুরাণ অনুসারে নারায়ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মসমূহ অনুসারে ভগবান বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। তাঁর চার হাতে পদ্ম, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র এবং আর এক হাতে রয়েছে গদা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে তিনি বিশ্বরূপ। তাঁর সহধর্মীর নাম দেবী লক্ষ্মী। এই বিষ্ণুই নারায়ণ বা হরি। তিনি এ বিশ্বের পালনকর্তা। তাঁর বাহন গরুড়।



**নারায়ণপূজার উদ্দেশ্য:** ভগবান নারায়ণ সকল জীবের আশ্রয়স্থল। নারায়ণপূজার মুখ্য উদ্দেশ্য নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ এবং তাঁর কৃপায় পারিবারিক সুখ-শান্তি অর্জন করা।

**সময়কাল:** যে-কোনো সময় বা মাসে নারায়ণপূজা করা যায়। তবে বৈশাখ মাসে নারায়ণপূজার প্রচলন অধিক লক্ষ করা যায়।

### পূজাপদ্ধতি

প্রতিমারূপে, শালথাম শিলারূপে, ত্বরপাত্রে বা জলে নারায়ণপূজা করা হয়। শালথাম শিলা এক প্রকার সামুদ্রিক জীবাশ্ম, যা ভারতের গঙ্গার নদীর তীরে শালথাম নামক গ্রামে পাওয়া যায়। এই জীবাশ্মটি গোল ও কালো রঙের হয়ে থাকে। এই শিলাকে নারায়ণচক্রও বলা হয়। নারায়ণপূজায় অন্যান্য পূজার মতোই সাধারণ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে নির্ধারিত মন্ত্রে নারায়ণের পূজা করা হয়। সাধারণত নারায়ণপূজার জন্য সাদা ফুলের প্রয়োজন হয়। তৃষ্ণসীপাতা নারায়ণের প্রিয়।

**পাঠ ৭ : নারায়ণের প্রণামমন্ত্র এবং নারায়ণপূজার শিক্ষা ও প্রভাব**

### নারায়ণের প্রণামমন্ত্র

ওঁ নমো ব্রহ্মগ্যদেবায় গোব্রাঙ্গধিতায় চ ।

জগদ্বিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

**সরলার্থ:** নারায়ণ ব্রহ্মগ্যদেব। তিনি কৃষ্ণ, তিনি গোবিন্দ। তিনি পৃথিবী, ব্রহ্মণ ও জগতের হিতসাধন করেন। তাঁকে বারবার নমস্কার জানাই।

### নারায়ণপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

নারায়ণ পালনের দেবতা। তাই নারায়ণদেবের কাছ থেকে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি তথা সকল জীবকে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করার শিক্ষা পাই। নারায়ণদেব দুষ্টের দমন করেন। আমরাও প্রয়োজনে দুষ্টের দমন করব। এ শিক্ষাও নারায়ণপূজার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি।

নারায়ণকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শক্তির সঞ্চার হয়। নারায়ণ আমাদের প্রতিপালনকারী দেবতা। তিনি আমাদের দেহের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করেন। নারায়ণপূজার মাধ্যমে ভক্তেরা ভগবান নারায়ণের আশীর্বাদ লাভ করেন। তাঁর আশীর্বাদ ভক্তদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে তোলে। নারায়ণপূজার ফলে মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ শান্তির জন্য পরম শৃঙ্খালারে ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।

**একক কাজ:** নারায়ণপূজার পাঁচটি প্রভাব লেখ।

**নতুন শব্দ:** শালগ্রাম শিলা, গঙ্গকী, জীবাশ্য, তাত্ত্বিকতা।

### পাঠ ৮ : শনিদেবের পরিচয় ও পূজাপদ্ধতি

#### শনিদেবের পরিচয়

হিন্দুধর্মে অন্যান্য দেবতার মতো শনিদেবও একজন উপাস্য দেবতা। তিনি সূর্য ও ছায়ার পুত্র এবং নবগংথের অন্যতম। জীবনে চলার ক্ষেত্রে যে-সকল বাধা-বিপত্তি আসে, শনিদেব তা দূর করেন। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বাধা-বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শনিদেবের পূজা করেন।

শনিদেবের চার হাত। তাঁর গায়ের রং কালো এবং পোশাকও কালো। তাঁর হাতে তরবারি, তীর ও ধনু দেখা যায়। তাঁর বাহন শকুন।



#### শনিদেবের পূজা

**সময়কাল:** শনি দেবতার নাম অনুসারে শনিবারে তাঁর পূজা করা হয়।

**শনিপূজার উদ্দেশ্য:** শনিপূজার উদ্দেশ্য হলো শনিদেবকে সন্তুষ্ট রাখা, বিভিন্ন ধরনের রোগ-পীড়া থেকে মুক্ত থাকা এবং মনের শান্তি বজায় রাখা।

### শনিদেবের পূজাপদ্ধতি

সাধারণত মন্দিরে বা পারিবারিক পর্যায়ে সূর্যাস্তের পরে শনিপূজা করা হয়। পূজার ক্ষেত্রে অন্যান্য পূজার মতো সকল ধরনের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়। পারিবারিক পর্যায়ে শনিপূজার ক্ষেত্রে বাড়ির আঙিনাকে বেছে নেয়া হয়। গৃহের অভ্যন্তরে শনিপূজা করা হয় না। পূজায় মন্ত্র ও শনিদেবের পাঁচালি পাঠ করা হয়। পাড়া-প্রতিবেশীদের পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। শনিপূজায় ভোগ হিসেবে পাঁচ প্রকারের খৃতুভিত্তিক ফল এবং পাঁচ রকমের ফুল নিবেদন করা হয়। কোনো-কোনো অঞ্চলে খিচুড়ি, দুধ, চিনি, বাতাসা, কলা, গুড়, মিষ্টান্ন ও ময়দার প্রসাদ তৈরি করা হয়। খিচুড়ি প্রস্তরের ক্ষেত্রে মুগের ডাল ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়াও পূজার উপকরণ হিসেবে পান-সুপারি, মধু, মাসকলাই, কালো তিল, বেগুনি বা কালো রঙের ফুলের প্রয়োজন হয়। শনিপূজাশেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

### পাঠ ৯ : শনিদেবের প্রণামমন্ত্র এবং শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

#### শনিদেবের প্রণামমন্ত্র

ও নীলাঞ্জনচয়প্রথ্যৎ রবিসূতমহাঽহম্ ।

ছায়ায়া গর্ভসমৃতৎ তৎ নমামি শনৈচরম् ॥

**সরলার্থ:** তোমার দেহ নীলবর্ণ, তুমি সূর্যদেবতার পুত্র, ছায়ার গর্ভে তোমার জন্ম, তোমাকে আমি নমস্কার জানাই।

#### শনিপূজার শিক্ষা ও প্রভাব

শনিদেবের পূজা করলে আমাদের আপদ-বিপদ দূর হয়। আমাদের দায়িত্বহীনতা, অপবিত্রতা ও পাপের কারণে শনিদেব খুব রুষ্ট হন। তখন আমরা কষ্ট পাই। কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের উপলক্ষ ঘটে। আমরা তখন দায়িত্বশীলতা ও পবিত্রতার প্রতি মনোযোগী হই। মা যেমন সন্তানকে গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও সংশোধনের জন্য শান্তি দেন, তেমনি শনিদেবও কখনো-কখনো আমাদের কষ্ট দিয়ে সংশোধন করেন এবং অধর্মের পথ থেকে ধর্মপথে ফিরিয়ে আনেন। তাই প্রতিসঙ্গাহে শনিবার শনিপূজা করা হিন্দুদের একটি নিয়মিত ধর্মকৃত্য।

**দলীয় কাজ:** শনিদেবের পূজায় ব্যবহৃত উপচারের একটি তালিকা তৈরি কর।

**নতুন শব্দ:** নবগঠ, পাঁচালি, কৃষ্ণবর্ণ।

## অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর:**

১. সাধারণত গৃহের ..... শনিপূজা করা হয় না ।
২. পূজাসামগ্ৰীকে ..... বা ..... বলে ।
৩. ..... জাপন কৰাকে পূজা বলে ।
৪. শঙ্খ ..... পূজা-উপকৰণ ।
৫. ..... থেকে সাকাৰ বৃপ্ত লাভ কৰেছেন বলে তাৰ নাম মনসা ।

**ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:**

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পার্বণ শব্দের অর্থ	সজীবতার প্রতীক ।
২. নারায়ণের প্রতিকৃতি	পৃথিবীকে নির্দেশ কৰে ।
৩. কলসের সবচেয়ে চওড়া অংশ	শনিদেব ।
৪. আমপাতা ও নারিকেল	উৎসব ।
৫. সূর্য ও ছায়াৰ পুত্র	শালগ্রাম শিলা । মূর্তি ।

**নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. দেব -দেবীৰ পূজা কেন কৰা হয় ব্যাখ্যা কৰ ।
২. নৈবেদ্য বলতে কী বুৰু ?
৩. নারায়ণপূজার তিনটি সুফল ব্যাখ্যা কৰ ।
৪. শালগ্রাম শিলা কী ?
৫. শনিদেবেৰ পূজায় কী-কী উপকৰণ ব্যবহাৰ কৰা হয় ?

**নিচের প্রশ্নগুলোৰ উত্তর দাও:**

১. সমাজজীবনে নারায়ণপূজার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কৰ ।
২. দেব-দেবীৰ পূজায় বিভিন্ন উপচাৰ ব্যবহাৱেৰ প্ৰয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কৰে এৱে একটি তালিকা প্ৰস্তুত কৰ ।
৩. পাৰিবাৰিক ও সামাজিক জীবনে মনসাপূজার প্ৰভাৱ বিশ্লেষণ কৰ ।

**বহনির্বাচনি প্রশ্ন:**

১. মনসাপূজা করা হয় কোন তিথিতে?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ক. শ্রীপঞ্জমী    | খ. নাগপঞ্জমী     |
| গ. কৃষ্ণ অয়োদশী | ঘ. শুক্রা অষ্টমী |

২. দেব-দেবীর পূজায় উপচার নিবেদনের তাংপর্য হলো -

- i. পূজাকে আনন্দদায়ক করা
- ii. মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করা
- iii. বিধিসম্মত পূজা সমাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. ii          |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**

অরণীর মা শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় শনিবার সন্ধ্যায় অরণীকে পূজাবিধি না জেনেই বাড়ির উঠানে শনিপূজার আয়োজন করতে হয়। পূজার উদ্দেশ্যে অরণী চার রকমের ফুল ও ফল সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপচার সহযোগে পূজার পাঁচালি পড়ে পূজা সম্পন্ন করে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে। কিন্তু পূজাটি বিধিসম্মতভাবে হয়েছে কি-না এ নিয়ে অরণীর মনে সংশয় থেকে যায় এবং সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে।

৩. পূজাবিধি অনুসারে শনিপূজায় অরণীর কত রকমের ফুল ও ফল নিবেদনের প্রয়োজন ছিল?

- |        |         |
|--------|---------|
| ক. দুই | খ. তিন  |
| গ. চার | ঘ. পাঁচ |

৪. অরণীর মানসিক দৃষ্টিক্ষেত্রে কারণগুলো হলো -

- i. দায়িত্বহীনতা
- ii. অটিমুক্তভাবে পূজা সম্পন্ন না করা
- iii. শনিদেব রুষ্ট হতে পারেন এই ভাবনা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**সূজনশীল প্রশ্ন:**

তন্মুক্তদের বাড়িতে প্রতিবছর মনসাপূজা করা হয়। এ পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রতি বাড়িতেই চলে উৎসব ও পারিবারিক নানা আয়োজন। পুরোহিত পূজার এক পর্যায়ে পশুবলি দেন। বলিদান তন্মুক্তের মনে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয় - কেন জীবহত্যা, কী তার শিক্ষা? সমাজজীবনে এ পূজায় শান্তির পথ কী?

ক. কোন দেবীকে সর্পকুলের জননী বলা হয়?

খ. পূজায় উপচার নিবেদনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. পুরোহিত কীভাবে মনসাপূজা সম্পন্ন করেন? তোমার পঠিত পূজাবিধির আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তন্মুক্তের মনের প্রশ্নগুলোর সমাধান উক্ত পূজার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## ষষ्ठ अध्याय

### धर्मीয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা

নীতি সম্পর্কিত শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলে এবং নীতি ধর্মের অঙ্গ। তাই নৈতিক শিক্ষাও ধর্মের অঙ্গ। যত শিক্ষাই প্রহ্লাদ করা হোক-না-কেন, যদি নৈতিকতা অর্জিত না হয়, তাহলে সে শিক্ষা মূল্যহীন। হিন্দু ধর্মবিষয়ক গ্রন্থসমূহে উপাখ্যানের মধ্য দিয়েও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা দেশপ্রেম ও নৈতিক গুণের ধারণা, উক্ত বিষয়ে ধর্মীয় উপাখ্যান এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানব।



#### এ অধ্যায়শেষে আমরা -

- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায় ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার নৈতিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- দেশপ্রেম ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারব।

## পাঠ ১ : দেশপ্রেম

দেশপ্রেম বলতে বোায় দেশের প্রতি ভালোবাসা। মানুষ যে-দেশে জন্মগ্রহণ করে, তার মাটি-জল-আলো-বাতাস তার দেহকে পৃষ্ঠ করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে। বড় হয়ে মানুষ তার মাতৃভূমির প্রতি মমতা অনুভব করে। মাতৃভূমির প্রতি এই মমত্বোধই দেশপ্রেম। দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নামই দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে – ‘জননী জন্মভূমিক্ষ স্বর্গাদপি গরীয়সী।’ অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। তাই যিনি দেশপ্রেমিক, তিনি দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উত্তৰ্ব স্থান দেন। তিনি সবসময় দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করেন। দেশের কোনো বিপদে দেশপ্রেমিক কখনো নীরব থাকতে পারেন না। নিজের জীবনের বিনিয়য়েও তিনি সে বিপদে ঝাপিয়ে পড়েন। দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হলে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি মহৎ শুণ। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক।

পৌরাণিক যুগে জনা, বিদুলা, কার্তবীর্যার্জুন প্রমুখ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। একালে এ মহাদেশে মহাআশা গাঙ্কী, ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রতিলিতা, রাণী রাসমণি, চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘা যতীন, রফিক, সালাম, বরকত, জববার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাহানারা ইমামসহ আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়, যারা দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁদের অবদান স্বর্ণক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে। মানুষ তাঁদের স্মরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে চেষ্টা করে।

**একক কাজ:** তোমার জানা একজন দেশপ্রেমিকের অবদান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

**নতুন শব্দ:** মমত্বোধ, স্বর্গাদপি, গরীয়সী, বিসর্জন, স্বর্ণক্ষেত্র, প্রদর্শিত।

## পাঠ ২ ও ৩ : কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন যেমন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি বীর ও দেশপ্রেমিক। রাজকার্যের ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি একবার রাজধানীর বাইরে অবকাশ যাপন করছিলেন।

গুণ্ঠরের মুখে এ খবর পেয়ে লক্ষার রাজা রাবণ সুযোগ বুঝে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন। কার্তবীর্যার্জুনের এক সেনানায়কের নেতৃত্বে ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। এরই মধ্যে সংবাদ পৌছানো হলো মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের কাছে। শুনে মহারাজ ক্রোধে আগুনের মতো জুলে উঠলেন: কি! আমার রাজ্য আক্রান্ত! আমার মাতৃভূমি শক্তির বিষাক্ত নিঃশ্঵াসে বিপর্যস্ত! আমি এখনই যুদ্ধে যাব।

একথা ভেবে রাজা কার্তবীর্যার্জুন অবকাশ যাপন স্থগিত করে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো।

একপক্ষ আক্রমণকারী। আরেক পক্ষ আক্রান্ত, কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্ধৃত। পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। তাই সৈন্যগণ কার্তবীর্যার্জুনের নেতৃত্বে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে সাগল। অবশেষে জয় হলো কার্তবীর্যার্জুনের। রাবণ পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন। সর্বে এই বার্তা পৌছে গেল। কথাটা মহামুনি পুলস্ত্যের কানে গেল। এ সময় তিনি স্বর্গলোকে ছিলেন। রাবণ পুলস্ত্যের নাতি। তাই তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিনি স্বর্গ থেকে চলে এলেন কার্তবীর্যার্জুনের রাজসভায়। কার্তবীর্যার্জুন পুলস্ত্যকে দেখে যথাযোগ্য অর্পণা দিয়ে বললেন, ‘কি সৌভাগ্য আমার, যেৰ না চাইতেই জয়।’ এই বলে তিনি পুলস্ত্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।



কার্তবীর্যার্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পুলস্ত্য মুনি বললেন, ‘তুমি দেবতাদের প্রিয়। ত্রিভূবন তোমার যশকীর্তনে মুখরিত। রাবণ আমার নাতি। তাকে পরাজিত করে তুমি বন্দি করে কারাগারে রেখেছ। আমি তার মুক্তি চাই, বৎস।’

কার্তবীর্যার্জুন বললেন, ‘রাবণ আমার রাজ্য আক্রমণ করেছিল। আমার দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা তাকে ধ্রুতিহত করেছে।’

শুনে পুলস্ত্য বললেন, ‘তোমার গভীর দেশপ্রেম আর বীরত্বের কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছে।’

কার্তবীর্যার্জুন বললেন, ‘আপনি পরম শ্রদ্ধেয়। আপনি যখন রাবণের মুক্তি চাইছেন, তখন তাকে মুক্তি দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।’

রাবণ মুক্তি পেলেন।

রাবণ তাঁর অপরাধ স্বীকার করলেন এবং অবনত ঘন্টকে দাঁড়িয়ে রাইলেন।

পুলস্ত্য বললেন, ‘তোমাদের উভয়ের কল্যাণ হোক।’

পুলস্ত্যের মাধ্যমে অশ্বিসাক্ষী করে কার্তবীর্যার্জুনের সাথে রাবণের মৈত্রী স্থাপিত হলো। পুলস্ত্য বিদায় চাইলেন তাঁদের কাছে। কার্তবীর্যার্জুন আর রাবণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় জানালেন মহামুনি পুলস্ত্যকে।

পুলস্ত্য চলে গেলেন স্বর্গে। রাবণ ফিরে গেলেন তাঁর নিজের রাজ্যে।

কার্তবীর্যার্জুন চেয়ে রইলেন তাঁদের গমন পথের দিকে। তাঁর চোখে পড়ল শ্যামল প্রান্তর। এই তাঁর দেশ, তাঁর স্বাধীন রাজ্য। আনন্দে-আবেগে ভরে উঠল কার্তবীর্যার্জুনের হৃদয়।

**উপাখ্যানের শিক্ষা:** দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে যাঁরা যুদ্ধ করেন, তাঁরা দেশপ্রেমিক।

**দলীয় কাজ:** কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম উপাখ্যানের শিক্ষার প্রায়োগিক দিক চিহ্নিত কর।

**নতুন শব্দ:** কার্তবীর্যার্জুন, শুণ্ঠর, অবকাশ, উদ্বৃক্ষ, বার্তা, পুলস্ত্য, সাষ্টাঙ্গে।

#### পাঠ ৪ : সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেমে উদ্বৃক্ষ মানুষ দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বার্থচিন্তার ওপরে উঠে পরের হিতার্থে কাজ করেন। এটাই তাঁর জীবনের ব্রত। দেশপ্রেমে উদ্বৃক্ষ হয়ে মানুষ তাঁর ধন-জন এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। দেশের যখন সংকটকাল উপস্থিত হয়, দেশ যখন বহিঃশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের স্বাধীনতা যখন বিপর্যস্ত হয়, যখন পরাধীনতা মানুষকে শৃঙ্খলিত করতে চায়, যখন বিদেশী শাসক দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তখনই মানুষ দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দেশের মর্যাদা রক্ষায় অকাতরে জীবন বিসর্জন দেন।

স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয়তাবোধ হলো দেশপ্রেমের প্রধান উৎস। স্বাধীনতার জন্য কত বীরের আত্মবলিদানে স্বদেশের মাটি হয় রক্তে রাঙ্গা। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তো দেশপ্রেমেরই এক জুলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রই লক্ষ-লক্ষ বাঞ্ছালিকে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বৃক্ষ করেছিল।

স্বদেশের যে-কোনো গৌরবে দেশপ্রেমিকমাত্রাই গর্ববোধ করেন। তেমনি দেশের দুর্দিনে শক্তিত চিন্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং নিঃশর্তে আত্মত্যাগ করতেও কৃষ্ণিত হন না। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নির্বিধায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। যুগে-যুগে দেশপ্রেমিকরা দেশের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হিন্দু ধর্মপ্রচেষ্টে দেশপ্রেমকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শুধু বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাই নয়, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করাও দেশপ্রেম। দেশের সম্পদ রক্ষা করাও দেশপ্রেম। দেশের উন্নতির জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্র যাতে সঠিকভাবে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, সেজন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবে দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নিজের দেশের কল্যাণের জন্য দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। কেবল নিজের বা নিজের পরিবারের স্বার্থ দেখলেই চলে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কথাও ভাবতে হয়। সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হয়। এর নামও দেশপ্রেম। ত্যাগ ও

তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম নামক নৈতিক গুণটি অর্জন করতে হয়।

দেশপ্রেম মানুষকে উদার করে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে উদ্ধৃত করে, আত্মসূখ বিসর্জন দেয়ার প্রেরণা দান করে। দেশপ্রেম মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যার মধ্যে দেশপ্রেম নেই তাকে যথার্থ মানুষ বলা যায় না। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কখনো দেশপ্রেমিক হতে পারে না। দেশপ্রেমিক দেশের সম্পদ, দেশের স্বার্থ, দেশের মর্যাদা প্রভৃতিকে নিজের সম্পদ, নিজের স্বার্থ ও নিজের মর্যাদা বলে মনে করেন। তাই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে যুক্তে শহিদ হলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

পরাধীনতা ব্যক্তিকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। সমাজের অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরাধীন ব্যক্তির কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আমরা দেশপ্রেমিক হব এবং দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব। দেশের জন্য, দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কৃষ্ণত হব না।

**একক কাজ:** সমাজ ও স্বদেশের জন্য তোমার করণীয়গুলো লেখ।

নতুন শব্দ: হিতার্থে, উৎসর্গ, শৃঙ্খলিত, আত্মবলিদান।

#### পাঠ ৫ : অধ্যবসায়

কোনো লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ যত্ন সহকারে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় গুণের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে উঠে। কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। অধ্যবসায় ধর্মেরও অঙ্গ। ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। ছাত্রজীবন আর অধ্যবসায় একই সূত্রে গাঁথা। বিদ্যার্জনের পথ কুসুমাঞ্চীর্ণ নয়। অলস, কর্মবিমুখ ও হতাশ শিক্ষার্থী কখনো বিদ্যালাভে সফল হতে পারে না। একজন অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী অলস মেধাসম্পন্ন হলেও তার পক্ষে সাফল্য অর্জন করা কঠিন নয়। কাজেই অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে হতাশ না হয়ে পুনরায় দ্বিতীয় উৎসাহ নিয়ে অধ্যবসায়ে মনোনিবেশ করা উচিত। যে-ব্যক্তি অধ্যবসায়ী নয়, সে জীবনের

কোনো সাধারণ কাজেও সফলতা লাভ করতে পারে না। জীবনের সফলতা এবং বিফলতা অনেকাংশে অধ্যবসায়ের ওপরই নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে, জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র হচ্ছে অধ্যবসায়। শুধু অধ্যবসায়ের বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, রবার্ট ক্রস প্রমুখ মনীষী জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

তাই আমাদের সকলেরই উচিত অধ্যবসায়ের মতো যথৎ গুণটি আয়ত্ত করা।

**দশীয় কাজ:** অধ্যবসায় গুণটির প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি করা।

নতুন শব্দ: সহিষ্ণুতা, মনোনিবেশ, কুসুমাঞ্জীর্ণ।

### পাঠ ৬ : অধ্যবসায়ী একলব্য

অনেককাল আগের কথা। তখন হস্তিনাপুরের কাছে এক গভীর অরণ্য ছিল। সেখানে বাস করতেন নিষাদদের রাজা হিরণ্যধনু। তাঁর পুত্র একলব্য। একলব্যের ইচ্ছে হলো, হস্তিনাপুরে গিয়ে অন্তর্গুর দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অন্তর্বিদ্যা শিখিবেন।

সে সময়ে হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঞ্চপুত্রগণ এবং দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে অন্তর্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন দ্রোণাচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বলা হয় কৌরব আর পাঞ্চ পুত্রদের বলা হয় পাঞ্চব।

একদিন দ্রোণাচার্য কৌরব এবং পাঞ্চবদের অন্তর্বিদ্যা দিচ্ছেন। এমন সময় সেখানে একলব্য এসে উপস্থিত। তাঁর কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, মাথায় পাথির পালক আর পরনে বঙ্গল। তিনি দ্রোণাচার্যকে সাঁষাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, ‘শুরুদেব, আমি আপনার নিকট অন্তর্বিদ্যা শিখতে চাই।’

দ্রোণাচার্য তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার পরিচয় কী, বৎস?’

একলব্য বললেন, ‘আমি নিষাদ বংশীয়। লোকে আমাদের ব্যাথ বলে। এখান থেকে দূরে অরণ্যে আমাদের বাস।’ দ্রোণাচার্য বললেন, ‘বৎস, এখানে আমি শুধু রাজপুত্রদের অন্তর্বিদ্যা শিক্ষা দেই। তোমাকে অন্তর্বিদ্যা শিক্ষা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

একথা শনে একলব্য ভীষণভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। মনের দুঃখে তিনি বনে ফিরে গেলেন। গভীর বনে প্রবেশ করে একলব্য লতা-পাতা দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন। তারপর তিনি মাটি দিয়ে দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। দ্রোণাচার্যকে মনে-মনে শুরু মেনে তাঁর মূর্তির সম্মুখে তিনি অহর্নিশ তীর-ধনুক নিয়ে অন্তর্বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। কঠোর অধ্যবসায়, নিরলস পরিশ্রম আর ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা তিনি ধনুর্বিদ্যার প্রায় সকল প্রকার কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেললেন।

এ সময়ে একদিন অঙ্গুর দ্রোগাচার্য কৌরব ও পাঞ্চবন্দের নিয়ে তাঁদের অঙ্গবিদ্যা শিক্ষার পরীক্ষা নিতে গভীর বনে গেলেন। সেখানে ছাউনি কেশে অবস্থান করছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রশিক্ষণশালী একটি কুকুর। অপরিচিত কাউকে দেখলেই কুকুরটি উচ্চস্থরে ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে চিন্কার করত।

তাঁদের শিবিরের অঞ্চল দূরেই ছিল একলব্যের সাধনার হাল। একলব্য গভীর মনোনিবেশে অঙ্গবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপ্তি। এমন সময় কুকুরটি সেখানে এসে উচ্চস্থরে ঘেউ-ঘেউ করে চিন্কার করতে আগল। একলব্যের সাধনা ভেজে গেল। তিনি সাতটি বাণ নিষ্কেপ করে কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিলেন। সে অবস্থায় কুকুরটি দ্রোগাচার্যের ছাউনিতে ফিরে গেল। তখন উপস্থিতি সকলেই লক্ষ করলেন কুকুরটি আর শব্দ করছে না। যুথিষ্ঠির কুকুরটির মুখ পরীক্ষা করে দেখলেন কেউ বাণ নিষ্কেপ করে কুকুরটিকে স্তুক করে দিয়েছে। তাঁরা সকলেই বিশ্বিত হলেন। কুকুরটির পেছন-পেছন তাঁরা পৌছে পেলেন একলব্যের কাছে এবং ফিরে এসে তাঁর কথা দ্রোগাচার্যকে জানালেন। দ্রোগাচার্যও বিশ্বিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, ধনুর্বিদ্যার এ কৌশল তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। অথচ কুকুরটিকে সেই কৌশলেই স্তুক করা হয়েছে।



দ্রোগাচার্য অঙ্গুলকে সঙ্গে নিয়ে ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একলব্যের কুটিরের সম্মুখে এসে দেখলেন, এক ব্যাধ-যুবক একগুচ্ছে তীর-ধনুক নিয়ে অনুশীলন করছেন। তাঁর পেছনে দ্রোগাচার্যের মাটির ঘূর্ণি। দ্রোগাচার্যের উপস্থিতি টের পেয়ে একলব্য তাঁর তীর-ধনুক মাটিতে রেখে এগিয়ে গেলেন শুরুর কাছে। তাঁকে সাঁষাঙ্গে প্রশান্ন করে একলব্য বললেন, 'শুরুদেব, আমি আপনার শিষ্য। আদেশ করুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি।'

দ্রোগাচার্য তাঁকে বললেন, 'বৎস, তুমি এ বিদ্যা কোথা থেকে শিখেছ?'

একলব্য কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, ‘আমি আপনাকে মনে-মনে শুরুপদে বরণ করে আপনার এই মূর্তি সামনে রেখে আপনার কাছ থেকেই এ-সকল কলাকৌশল শিক্ষা করেছি – নিজের অধ্যবসায় আর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।’ দ্রোগাচার্য বিস্মিত হলেন। অর্জুনও বিস্মিত হয়ে মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কোনো অন্তর্গুরুর কাছে না শিখে নিজে-নিজে গভীর অধ্যবসায়ে এমন অন্ত্বিদ্যাশিক্ষা সহজ কথা নয়।

**উপাধ্যানের শিক্ষা:** অধ্যবসায় দ্বারা যে-কোনো কাজে সাফল্য অর্জন করা যায়। অধ্যবসায়ীর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

**একক কাজ:** অধ্যবসায়ের শিক্ষা তোমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখাও।

**নতুন শব্দ:** একলব্য, দ্রোগাচার্য, হিরণ্যধনু, নিরলস, স্তুতি।

### পাঠ ৭ : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অধ্যবসায় একটি অবিচ্ছেদ্য নৈতিক শুণ।

ব্যক্তি-জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যবসায় ছাড়া শিক্ষা আতঙ্ক হয় না। তাই শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠনে অধ্যবসায় অভ্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষ সমাজবন্ধভাবে বসবাস করে। সমাজের প্রতি তার বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজের সকলেই যদি স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে সমাজে ও রাষ্ট্রে কোনো হানাহানি থাকবে না, থাকবে না কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। কিন্তু মুখে বললেই নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা হয় না। এর জন্য চাই কাজের প্রতি একাগ্রতা, ধৈর্য, দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা। আর এ গুণাবলির সমন্বয়ে যে বিশেষ নৈতিক শুণ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় তাকে বলে অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ই মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করে। অধ্যবসায়ের শুণেই মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। অধ্যবসায় ছাড়া কেউ কখনো উন্নতি করতে পারে না, কোনো জাতি তার কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না।

সভ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত আজকের বিশ্ব মানুষের দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের পরিণতি। বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস নিরলস অধ্যবসায়ের ইতিহাস। মনীষীগণ সারাজীবন সাধনা করে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। মানুষের অধ্যবসায় না থাকলে সভ্যতার এই অগ্রগতি সম্ভব হতো না।

অধ্যবসায়ের যথার্থ কার্যকারিতার জন্যই জীবনের পথে সকল বাধা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের জীবনে যে চিরায়ত সংগ্রামী শক্তি নিহিত আছে, তার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ই মানুষকে করে তোলে সংগ্রামী, উদ্যোগী আর কর্তব্যপরায়ণ। নিজের অসহায়ত্ব উপেক্ষা করে অধ্যবসায়ের প্রয়োগে মানুষ হয় স্বনির্ভর।

অধ্যবসায় একটি মহৎ গুণ। জাতীয় জীবন মর্যাদাবান হয়ে ওঠে অধ্যবসায়ের এই মহৎ গুণে। জাতির প্রতিটি মানুষ যদি অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠে তাহলে সে জাতি অবশ্যই সুনাম ও গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠবে।

যে জাতি যত বেশি অধ্যবসায়ী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। রাষ্ট্রীয় জীবনে গৌরব ও সাফল্য আনয়নের জন্য রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে অধ্যবসায়ী হতে হয়। যে-সকল রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মসংক্ষারক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজ-সংক্ষারক জীবনে সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী।

শুধু নিজের জীবনে সাফল্য লাভ করলেই চলবে না। ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্যও অনবরত সাধনা করে যেতে হবে। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিশ্বসভায় গৌরবজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের সকলকেই অধ্যবসায়ী হতে হবে। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**দলীয় কাজ:** ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের প্রভাব চিহ্নিত কর।

**নতুন শব্দ:** অবিচ্ছেদ্য, উৎকর্ষ, চিরায়ত, পরাধীনতা, ধর্মসংক্ষারক, মহিমান্বিত।

## অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর:**

১. জননী ও জন্মভূমি ..... চেয়েও বড়।
২. আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সাধারণত ..... হয় না।
৩. কার্তবীর্যার্জুন একবার রাজধানীর বাইরে ..... যাপন করছিলেন।
৪. অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় ..... সমষ্টি।
৫. একলব্যের ইচ্ছে হলো ..... কাছ থেকে অন্তর্বিদ্যা শেখার।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. স্বদেশের গৌরবে দেশপ্রেমিকমাত্রাই	একই সূত্রে গাঁথা।
২. চন্দ্রবংশীয় এক রাজা	সভ্যতার অগ্রগতি হতো না।
৩. ছাত্রজীবন আর অধ্যবসায়	রাজ্য আক্রমণ করলেন।
৪. অধ্যবসায় না থাকলে	গর্ববোধ করেন। কার্তবীর্যার্জুন।

### নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায়? দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।
২. ‘দেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ’ – ব্যাখ্যা কর।
৩. একলব্য কীভাবে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করলেন? ব্যাখ্যা কর।
৪. একলব্যের উপাখ্যানটি পড়ে তুমি কী শিক্ষা পেলে? ব্যাখ্যা কর।

### নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. কাত্তীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের মূল্যায়ন কর।
২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশপ্রেমের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
৩. ‘জীবনে সাফল্যলাভের মূলমন্ত্র অধ্যবসায়’ – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
৪. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. রাবণ কোন মুনির নাতি?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. কাশ্যপ | খ. পুলস্ত্য |
| গ. চ্যৰন  | ঘ. দুর্বাসা |

২. নিষাদদের রাজা ছিলেন কে?

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ক. হিরণ্যাক্ষ | খ. হিরণ্যকশিপু |
| গ. হিরণ্যধনু  | ঘ. হিরণ্যমনু   |

৩. দেশপ্রেম বলতে বোঝায় –

- i. মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ
- ii. ব্যক্তিস্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া
- iii. জাতির মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**

শ্যামল ১৯৭১ সনে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। যখন পঁচিশে মার্চ কালো রাতে পাক হানাদার বাহিনী নিরপরাধ ঘূমস্ত মানুষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যা করে, তখন তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার মাস্থানেক পূর্বেই এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

৪. শ্যামলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোন নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে?

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ক. দয়া     | খ. সততা      |
| গ. দেশপ্রেম | ঘ. অধ্যবসায় |

৫. শ্যামলের আত্মত্যাগের মর্মার্থ হলো -

- i. স্বদেশকে ভালোবাসা
- ii. মাতৃভূমির প্রতি অমৃতবোধ
- iii. পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সূজনশীল প্রশ্ন:

সুপ্রিয়া বারবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। একদিন সে তার বান্ধবীর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তার হতাশার কথা ব্যক্ত করে। বান্ধবী তাকে পরামর্শের ছলে বলে, ‘একবার না পারিলে দেখ শতবার।’ কথাটি সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে এবং সে সবকিছু ভুলে পূর্ণেদ্যমে পড়ালেখা শুরু করে। এবার সে পরীক্ষায় পাস করে। এ সফলতায় তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

- ক. ধ্রুতরান্ত্রের পুত্রদের কী বলা হয়?
- খ. মহামুনি পুলস্ত্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. বান্ধবীর পরামর্শ কেন সুপ্রিয়ার মনে গভীর দাগ কাটে তা তোমার অর্জিত নৈতিক শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রিয়ার সাধনার প্রভাব পঠিত বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

## সপ্তম অধ্যায়

### আদর্শ জীবনচরিত

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ জন্মেছিলেন, যারা আজীবন অন্যের উপকার করে গেছেন। নিজের কথা ভাবেন নি। তাঁদের কোনো লোভ-মোহ ছিলনা। পরোপকারই ছিল তাঁদের একমাত্র ভাবনা। জগতের কল্যাণ করাই ছিল তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁরাই হলেন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। তাঁদের জীবনীই হচ্ছে আদর্শ জীবনচরিত। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়তে পারি। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে এমন বেশ কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর নিগমানন্দ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, মা আনন্দময়ী এবং শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদের জীবনী সম্পর্কে জানব এবং নৈতিকতা গঠনে তাঁদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।



#### এ অধ্যায়শেষে আমরা -

- নৈতিকতা গঠনে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-পরবর্তীকালের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিতের আলোকে তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর নিগমানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে মা আনন্দময়ীর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

### ପାଠ ୧, ୨ ଓ ୩ : ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

ଆମରା ସତ ଶ୍ରେଣିତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଜନ୍ୟ ଓ ଶୈଶବକାଳେର କଥା ଜେନେଛି । ସତ୍ୟ ଶ୍ରେଣିତେ ଜେନେଛି ତାର ବାଲ୍ୟ ଓ କୈଶୋରେର କଥା । ଏଥିନ ଆମରା ଜାନବ ତାର କୈଶୋର-ପରବତୀ ଥିକେ ଶୁକ୍ଳ କରେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକାଙ୍ଗେର କଥା । ଆମରା ଆଗେଇ ଜେନେଛି ଯେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଜେନ ଅସ୍ତରିଂ ଭଗବାନ । ପୃଥିବୀତେ ସଥିନ ଧର୍ମର ଗ୍ରାନି ଦେଖା ଦେଯ, ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତଥିନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟର ଦମନ ଓ ଶିଷ୍ଟର ପାଲନେର ଜନ୍ୟ ତିନି ଯୁଗେ-ଯୁଗେ ଜନ୍ୟଗତି କରେନ । ଶୈଶବେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଓ କୈଶୋର କୀଭାବେ ତିନି ଦୁଷ୍ଟଦେର ଦମନ କରେଛେ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟଦେର ପାଲନ କରେଛେ ତା ଆମରା ଜେନେଛି । ଏଥିନ ଆମରା ତାର କୈଶୋର ଥିକେ ପରବତୀ ଜୀବନେର ଶୁକ୍ଳତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟନାବଳି ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କେ ଅବଗତ ହବ ।



### କଂସବଧ

କଂସ ଛିଲେନ ମଧୁରାର ରାଜ୍ୟ । ଭୀଷଣ ଅଭ୍ୟାଚାରୀ ଏକଜନ ମାନୁଷ । ନିଜେର ପିତା ଉତ୍ସେନକେ ବନ୍ଦି କରେ ତିନି ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରେନ । କୃଷ୍ଣ ତାର ହଞ୍ଚା - ଏହି ଦୈବବାଣୀ ଶୁନେ ଶିଶୁକାଳ ଥିକେଇ ତିନି କୃଷ୍ଣକେ ମାରାର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ପାରେନ ନି । ତାଇ ବଲେ ତିନି ବସେ ନେଇ । ଏବାର କୌଶଳେ ତାଙ୍କେ ମାରାର ପରିକଳ୍ପନା କରଲେନ । ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧେ ଆମତ୍ରଣ ଜାନାନୋର ଜନ୍ୟ ତିନି ଅକ୍ରୂରରେ ପାଠାଲେନ କୃଷ୍ଣର କାହେ । କୃଷ୍ଣ-ବଲରାମ ତଥିନ ବୃଦ୍ଧାବନେ । ଅକ୍ରୂର ଗିଯେ କଂସର ଦୂରଭିସନ୍ଧିର କଥା ବଲେ ଦିଲେନ । କୃଷ୍ଣ ଓ ବଲରାମ ମଧୁରାୟ ଏଲେନ । ତାଙ୍କେର ହାତେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ମାରା ଗେଲ । ତା ଦେଖେ କଂସ କ୍ଷିଣ ହେଁ ଗେଲେନ । ତିନି କୃଷ୍ଣକେ ମାରାର ଜନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସାମାଇଇ କୃଷ୍ଣ ଲାକ୍ଷ ଦିଯେ ତାର ରଥେ ଉଠିଲେନ । ଚଳ ଧରେ ମାଟିତେ ଫେଲେ କଂସକେ ହତ୍ୟା କରେନ । ତାରପର ଉତ୍ସେନ, ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ ପ୍ରସୁତକେ ମୁକ୍ତ କରେନ । ଉତ୍ସେନକେ ମଧୁରାର ରାଜ୍ୟ କରେନ । ମା-ବାବାର ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ, ବଲରାମ ଓ ମଧୁରାୟ ଥିକେ ଯାନ । ମଧୁରାୟ ଶାନ୍ତି ଫିରେ ଆସେ ।

### ଜରାସନ୍ଧ ବଧ

ଜରାସନ୍ଧ ଛିଲେନ ମଗଥେର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଂସର ଶଶ । ତିନିଓ ଭୀଷଣ ଅଭ୍ୟାଚାରୀ ଛିଲେନ । କଂସର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁନେ ତିନି ଭୀଷଣ ରେଗେ ଯାନ । ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିଯେ ତିନି ମଧୁରା ଆକ୍ରମଣ କରେନ । କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣର ହାତେ ତାର ପରାଜୟ ଘଟେ । କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କେ କ୍ଷମା କରେ ଦେଲ । ଏତେ ଜରାସନ୍ଧ ଲଜ୍ଜିତ ହନ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ଼େ ଯାଯ । ତାଇ କୃଷ୍ଣକେ ମାରାର ଜନ୍ୟ ତିନି ପରପର ସାତବାର ମଧୁରା ଆକ୍ରମଣ କରେନ । କୃଷ୍ଣ ତାରପର ଓ ତାଙ୍କେ ମାରେନ ନି । କିନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ ଏକ ବିରାଟ ଅନ୍ୟାୟ କାଜ କରତେ ଯାଚିଲେନ । ରାତ୍ରଦେବେର ପୂଜାର ଜନ୍ୟ ତିନି ଏକଶ ନରବଳି ଦେବେନ ବଲେ ହିର କରେଛିଲେନ । ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତିନି ୮୬ ଜନ ରାଜାକେ ବନ୍ଦି କରେ ରେଖେଛିଲେନ । ଆର ୧୪ ଜନ ହଲେଇ ତିନି ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ କାଜ ସମ୍ପଲ୍ଲ କରବେନ । ଏ ଖବର କୃଷ୍ଣ ଜାନତେ ପେରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଞ୍ଚମ ଭୀମର ସାହାଯ୍ୟେ ତାଙ୍କେ ବଧ କରେନ । ଫଳେ ଏକଶ ଜନ ରାଜାର ପ୍ରାଣ ବେଁଚେ ଯାଯ ।

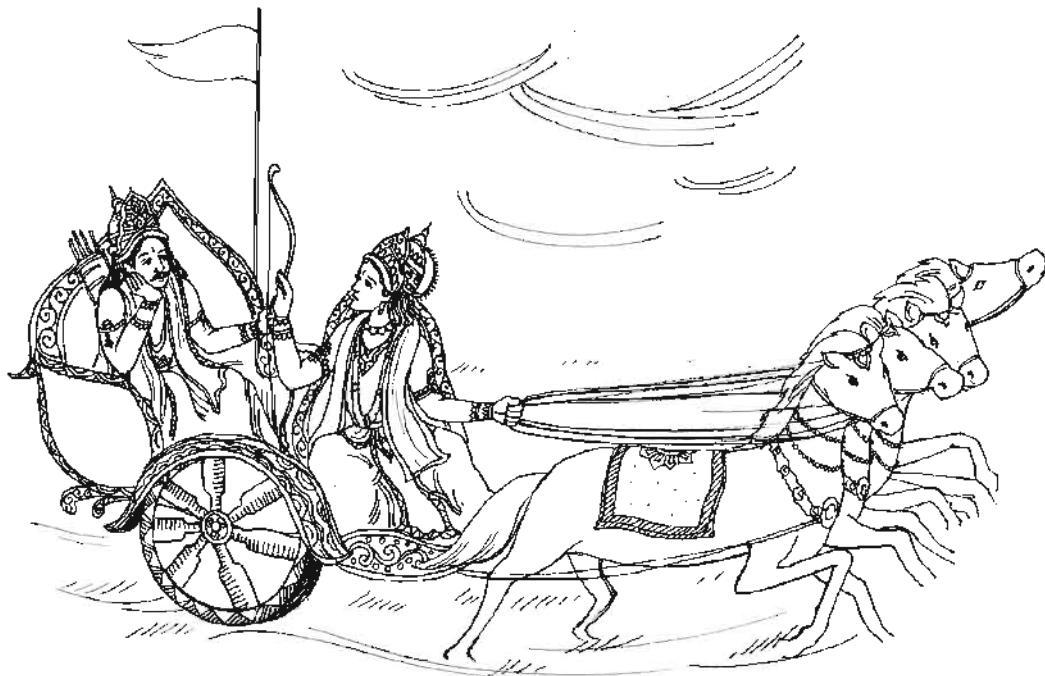
### শিশুপাল বধ

শিশুপাল ছিলেন চেদিরাজ্যের রাজা। কৃষ্ণের আজ্ঞায়। পিস্তুত ভাই। কিন্তু ভীবণ অত্যাচারী। তাই শিশুপালের মা কৃষ্ণকে অনুরোধ করে বলেছিলেন - 'বাবা, তুমি ওর একশটি অপরাধ ক্ষমা করো।' কৃষ্ণ তা করেছিলেন। শুরুজনের কথা রেখেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ায় ঈর্ষাণ্বিত শিশুপাল তাঁর নিন্দা শুরু করেন। পাঞ্চবদ্দেরও গালমন্দ করেন। যুদ্ধের হৃষকি দেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁকে হত্যা করেন।

### কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা

ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চ দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ত। তাই ছোট ভাই পাঞ্চ হস্তিনাপুরের রাজা হন। পাঞ্চর পাঁচ ছেলে। যুধিষ্ঠির বড়। তাঁদের বলা হয় পাঞ্চ। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলে। বড় দুর্যোধন। তাঁদের বলা হয় কৌরব। কৌরবরা ছিলেন অসৎ এবং দুরাচার। আর পাঞ্চবরা ছিলেন সৎ ও সদাচারী।

পাঞ্চর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্যোধন তা মানলেন না। তাই ধৃতরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। পাঞ্চবদ্দের রাজধানী হলো ইন্দ্রপ্রস্থ। কিন্তু দুর্যোধন তাতে খুশি নন। তাঁর পুরো রাজ্যটাই চাই। তাই তিনি একদিন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেন। মনে তাঁর দুরভিসংজ্ঞি। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির হেরে যান। খেলার শর্ত অনুযায়ী পাঞ্চবরা তের বছরের জন্য



বনে যান। বনবাস শেষে ফিরে এসে রাজ্য দাবি করেন। কিন্তু দুর্যোধন বললেন, বিনা যুদ্ধে তিনি রাজ্য দেবেন না। কৃষ্ণ তখন যুদ্ধ ঠেকানোর জন্য

দুর্যোধনের কাছে যান। অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু দুর্যোধন কোনো কথাই শুনলেন না। অগত্যা কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে তুমল যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ পাঞ্চবদের পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ লোক নিহত হয়। কৌরবদের সবাই নিহত হন। যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।

### অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই পক্ষ মুখোমুখি। কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। অর্জুন বিপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে কৃষ্ণকে বললেন যুদ্ধ করবেন না। আত্মীয়দের হত্যা করে তিনি রাজ্য চান না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ‘তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ করা। তা না হলে তার অধর্ম হয়। অপযশ হয়। তাছাড়া আজ্ঞার মৃত্যু নেই। দেহান্তর ঘটে মাত্র। তুমি যাদের দেখে মায়া করছ, তারা নিজেদের দোষে মৃত্যুকে বরণ করে আছে। তুমি উপলক্ষ মাত্র। কাজেই যুদ্ধ করে তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। যার যা কর্তব্য তা পালন করাই ধর্ম।’

কৃষ্ণ একথা বলার পর অর্জুনের মোহঙ্গ হয় এবং তিনি যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অন্যায়ের পরাজয় ঘটে, ন্যায়ের জয় হয়। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ বারবার দুষ্টকে দমন করে শিষ্টের পালন করেছেন এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

**দলীয় কাজ:** দুষ্টের দমনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবদান লিখে একটি তালিকা তৈরি কর।

### শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুবৎসল্য

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল। সুদামা নামে তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন। একই শুরুর নিকট তাঁরা পড়াশোনা করেছেন। সুদামা খুবই গরিব। তবে ব্রহ্মবিদ। তাঁর কোনো লোভ-লালসা নেই। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা। তদুপরি স্বয়ং ভগবান হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র।

একদিন সুদামার স্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘তোমার বন্ধু কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা। তাঁর কাছে গেলে হয়তো কিছু অর্থ পাওয়া যেত। তাতে আমাদের অভাব অনেকটা ঘূচত।’ সুদামা অর্থের লোভে নয়, অনেক দিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে এই ভেবে যেতে রাজি হলেন। তিনি একদিন সত্য-সত্যই দ্বারকায় রওনা হলেন। যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণকে উপহার দেয়ার জন্য কিছু চিড়ার খুদ সুদামার উভরীয় বন্ধে বেঁধে দিলেন।

সুদামা দ্বারকায় পৌছলেন। তাঁকে দেখামাত্র কৃষ্ণ দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণের স্ত্রী রঞ্জিণী তাঁকে বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ‘বন্ধু, আমার জন্য কী এনেছ?’ সুদামা তখন সেই চিড়ার খুদ বের করে দিলেন। কৃষ্ণ পরম তত্ত্বিভরে তা খেলেন। তারপর তাঁরা অনেকক্ষণ গল্ল করলেন। কিন্তু সুদামা একবারও অর্থের কথা বললেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুর বেশভূষা দেখে সবই বুঝতে পারলেন। তাই তিনি ঐশীবলে সুদামার বাড়ির অবস্থা পরিবর্তন করে দিলেন। সুদামা ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁর কুড়ে ঘরের জায়গায় বিশাল অঞ্চলিকা। ঘরে ধন-সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু তিনি আগের মতই সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং ব্রহ্মের উপাসনা করতেন।

**একক কাজ:** তোমার জানা বন্ধুপ্রতীতির কোনো ঘটনা সম্পর্কে লেখ।

### শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

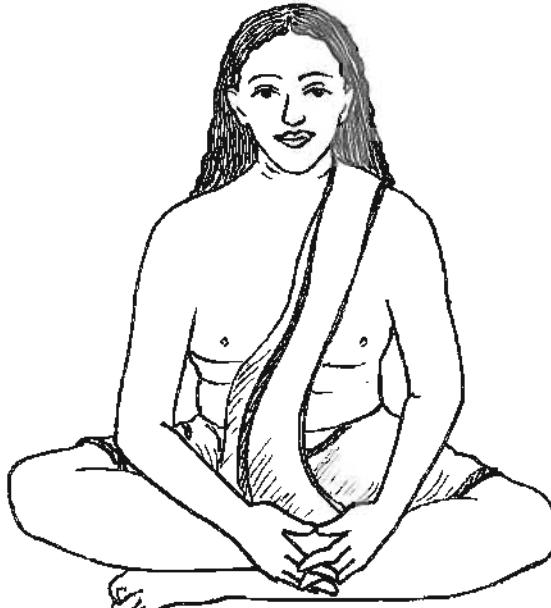
ভগবান যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অবতারকর্পে জন্ম নিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ হয়েছে। দুষ্টদের দমন করা হয়েছে। সমাজে ধর্ম ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। তাই এবার তাঁর বৈকুণ্ঠে যাবার পালা। বলরাম ইতোমধ্যে ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণ তাই বনে প্রবেশ করে একটি অশ্বথ বৃক্ষের নিচে বসে আছেন। দূর থেকে জরা নামে এক ব্যাধ তাঁকে হরিণ মনে করে শর নিষ্কেপ করে। শরটি কৃষ্ণের পায়ে লাগে। এই শরাঘাতেই কৃষ্ণ ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, অন্যায় ও অসত্য এক সময় পরাজিত হয়। সমাজে দুষ্টদের ঠাঁই নেই। ভগবানও তাদের ক্ষমা করেন না। ভগবান ধনী-গরিব সকলকেই ভালোবাসেন। যার যা কর্তব্য তা পালন করা ধর্মের অঙ্গ। অতএব, আমরা এই শিক্ষাগুলো আমাদের জীবনে কাজে লাগাব। নতুন শব্দ: গ্রানি, অক্রুর, স্পৃহা, অভীষ্ট, রাজসূয়, ইন্দ্রপ্রস্ত, ঐশ্বীবল, অন্তর্ধান।

### পাঠ ৪ ও ৫ : শ্রীহরিচান্দ ঠাকুর

গোপালগঞ্জ জেলার কাশীয়ানী উপজেলার অন্তর্গত  
সাফলিডাঙ্গা একটি গ্রাম। এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ  
করেন হরিচান্দ ঠাকুর। বাংলা ১২১৮ সনের  
(১৮১১ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে। সেদিন ছিল  
কৃষ্ণপক্ষের আয়োদশী তিথি।

হরিচান্দ ঠাকুরের পিতার নাম যশোমন্ত ঠাকুর এবং  
মাতা অনুপূর্ণা দেবী। যশোমন্ত ছিলেন মৈথিলী  
ত্রাক্ষণ এবং নিষ্ঠাবান বৈক্ষণব। হরিচান্দ যশোমন্তের  
দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর অপর তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে  
বৈক্ষণব দাস, গৌরী দাস ও স্বরূপ দাস। এরা  
সকলেই ছিলেন বৈক্ষণব।



হরিচান্দ ছিলেন খুবই মেধাবী। কিন্তু বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা পাঠ তাঁর ভালো লাগেনি। তাই মাত্র করেক  
মাস গিয়ে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। মিশে যান রাখাল বন্দুদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে গোচারণ করেন।  
খেলাধুলা করেন। কখনো বা গান করেন। তাঁর গানের গলা ছিল খুবই মধুর। তাই তাঁর গান, ভজন,  
কীর্তন শুনে সবাই মুক্ত হয়ে যেত। তাঁর চেহারাও ছিল খুবই সুন্দর। ব্যবহার ছিল অমায়িক। এসব  
কারণে সবাই তাঁকে পছন্দ করত। রাখাল বন্দুরা তাঁকে বলত ‘রাখাল রাজা’।

হরিচাঁদ ঠাকুর ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ বিষয়টি তাঁর মধ্যে আরো প্রকট হয়। তিনি ক্রমশ ধর্মের দিকে চলে যান। তবে তিনি নতুন কোনো ধর্মত প্রচার করেন নি। তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হরিনাম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে।’ এই নাম সংকীর্তনই হচ্ছে তাঁর সাধন-ভজনের পথ। তিনি এই হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। এজন্য তাঁর এই সাধনপথের নাম হয় ‘মতুয়া’। আর তাঁর অনুসারীদের বলা হয় ‘মতুয়া সম্প্রদায়’।

মতুয়াবাদের মূল কথা হলো মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মান্তি এবং সার্বিক কল্যাণ সাধন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা – এই তিনটি স্তম্ভের ওপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। সাধনার লক্ষ্য সত্যদর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এজন্য চাই প্রেম। প্রেমের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্র দেহ-মনে প্রেমের উদয় হয়। তখন ভক্তের অন্তরে প্রেমময় হরি জাগ্রত হন।

হরিচাঁদ ঠাকুর হরিনামের মাধ্যমে সামাজিকভাবে অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করেন। তিনি বলতেন, ‘দল নাই যাব, বল নাই তাব।’ এর ফলে মতুয়াবাদ এক বিরাট আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মতুয়া সম্প্রদায় ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র।

ঠাকুর বলতেন, ‘ধর্মচার জন্য সংসার ত্যাগ করতে হয় না। সংসারে থেকে সংসারের কাজ করেও ধর্মচার করা যায়।’ তাঁর নির্দেশই ছিল, ‘হাতে কাম, মুখে নাম।’ তিনি নিজেও সংসারী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও তিনি কন্যা ছিলেন। পুত্রবা হলেন শুরুচরণ ও উমাচরণ। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শুরুচরণই শুরুচাঁদ নামে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে পূজিত হন। মতুয়া সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে বিশ্বের অবতার হিসেবে জ্ঞান করেন। তাই তাঁরা বলেন:

রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ।

সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ॥

ঠাকুরের মতুয়াবাদে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ এসবে কোনো ভেদ নেই। যে-কেউ হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে। সাফলিডাঙ্গা গ্রামের পাশে। সেখানে প্রথান হরিমন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিমন্দির আছে। ২০১০ সনে ঢাকার রমনা কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধ্যকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ওড়াকান্দিতে মহাবারণি স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন পর্যন্ত মেলা বসে। হাজার-হাজার লোকের সমাগম ঘটে ঐ স্নান ও মেলায়। তাঁরা হরিচাঁদ ও শুরুচাঁদ ঠাকুরকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বাংলা ১২৮৪ সনের (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) ২৩এ ফাল্গুন ৬৬ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সৎবরণ করেন। ঠাকুরের জীবন ও আদর্শ নিয়ে কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেছেন ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’ গ্রন্থ। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হরিমন্দিরে মতুয়াসহ ভক্তরা নিয়মিত নামকীর্তন করেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

### ঠাকুরের কয়েকটি বাণী

১. হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি নাম সার ।

প্ৰেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার॥

২. জীবে দয়া নামে রংচি মানুমেতে নিষ্ঠা ।

ইহা ছাড়া আৱ যত সব ক্ৰিয়া ভৃষ্টা॥

৩. গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাৰোদয় ।

সেই যে পৱন সাধু জানিও নিষ্যয়॥

৪. গৃহকৰ্ম গৃহধর্ম কৱিবে সকল ।

হাতে কাম মুখে নাম ভক্তি প্ৰবল॥

৫. গীহস্থ্য তোমার ধৰ্ম অতি সনাতন ।

দুষ্টের দমন আৱ শিষ্টের পালন॥

হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁৰ অনুসারীদেৱ বাবটি উপদেশ দিয়েছেন, যেগুলো ‘দ্বাদশ আজ্ঞা’ নামে পরিচিত। এই আজ্ঞাগুলো সবাৱ জন্যই পালনীয়। আজ্ঞাগুলো হলো: (১) সদা সত্য কথা বলবে। (২) পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি কৱবে। (৩) নারীকে মাতৃজ্ঞান কৱবে। (৪) জগৎকে প্ৰেম কৱবে। (৫) সকল ধৰ্মে উদার থাকবে। (৬) জাতিভেদ কৱবে না। (৭) হরিমন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৱবে। (৮) প্ৰত্যহ প্ৰার্থনা কৱবে। (৯) ঈশ্বৰে আত্মান কৱবে। (১০) বহিৱজে সাধু সাজবে না। (১১) ষড়ৱিপু বশে রাখবে। (১২) হাতে কাম, মুখে নাম কৱবে।

**দলীয় কাজ:** হরিচাঁদ ঠাকুরের উপদেশগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈৱি কৰ ।

নতুন শব্দ: আত্মোন্নতি, মতুয়া, মহাৰাষ্ট্ৰণি, বহিৱজে, ষড়ৱিপু ।

## পাঠ ৬, ৭ ও ৮ : স্বামী বিবেকানন্দ

‘মন চল নিজ নিকেতনে  
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে  
ভয় কেন অকারণে ।’

সুলিলিত কষ্টে অসীম দরদ দিয়ে গানটি গাইলেন এক যুবক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদের তন্মুখ হয়ে গানটি শুনলেন – কোলকাতার সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে বসে। তিনি জানতে চাইলেন কে এই যুবক? সুরেন্দ্রনাথ বললেন – বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ। এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদিদ্ধ্যাত হন। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কোলকাতায় তাঁর জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল। মাতা ভূবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণা সুগৃহিণী।

প্রথম দেখায়ই ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভালো লাগে নরেন্দ্রনাথকে। তিনি আকুল কষ্টে নরেন্দ্রনাথকে বলেন, ‘একদিন এসো দক্ষিণেশ্বরে ।’

নরেন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন একটু অন্য রকম। নিষ্ঠাকৃতা, সত্যবাদিতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, জীবে দয়া – এসব ছিল তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের জাত-পাত ভেদ তাঁর ভালো লাগত না। তাঁর পিতার মক্কেলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুণ্ড, মুসলমান, খ্রিষ্টান সবই ছিল। বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁদের সবার জন্য আলাদা আলাদা হুঁকা ছিল তামুক সেবনের জন্য। প্রত্যেক হুঁকার গায়ে নাম লেখা ছিল। নরেন্দ্রনাথ একদিন সব হুঁকায় মুখ লাগাইলেন। এমন সময় পিতা বিশ্বনাথ এসে পড়েন। তিনি ছেলেকে বলেন, ‘এ কী হচ্ছে, নরেন?’ নরেন্দ্রনাথ বললেন, ‘আমি সব হুঁকা টেনে দেখলাম, কৈ আমার তো জাত গেল না!’ ছেলের এই অস্তুত কথা শুনে পিতা হেসে ফেললেন। প্রভাত যেমন সমস্ত দিনের ইঙ্গিত দেয়, এই ঘটনাও তেমনি সেদিন ভবিষ্যতের সর্বজীবে সমদর্শী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন। এন্টার্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উন্নীর্ণ হন। ১৮৮৪ সনে তিনি বিএ পাস করেন। এর পরপরই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে তাঁদের পরিবার দারকণ অর্থসংকটে পড়ে। মা এবং ছোট ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় চাকরির সঞ্চাল করেন। কিন্তু সুবিধা হয় না। অবশেষে কোলকাতার এ্যাটর্নি অফিসে একটা কাজ নেন এবং বই অনুবাদ করে কিছু-কিছু রোজগার করতে থাকেন।

এ-সময়ে নরেন্দ্রনাথের মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল জীব্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। জীব্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজেসও করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও প্রশ্নটি করেছিলেন। কিন্তু কারো উত্তরে তিনি

সন্তুষ্ট হতে পরেননি। এমন সময় একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যান। সুযোগযতো তিনি রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি দৈশ্বর দেখেছেন?’ রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, ‘হ্যা, দেখেছি, যেমন তোকে দেখছি; চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।’

এই সহজ-সরল উভারে শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মঞ্জু দীক্ষা নেন।

নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ধ্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করে ভারতব্রহ্মণে বের হন। তিনি দেখেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই দুরবস্থা দেখে তিনি খুব ব্যথিত হন। তাই কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা যায়, সে-কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কল্যাকুমারীকায় ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে দেবতাঙ্গানে মানুষের সেবা। এই ধর্মমঞ্জু ভারতবাসীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আমেরিকা যান। সেখানে ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – দৈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরম্পরার ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।’ ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুঝ হয়ে আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট বলেছিলেন, ‘ইনি এমন একজন মানুষ, যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।’

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা ভয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়ান



এবং বক্তৃতা দেন। তিনি বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব তুলে ধরেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হিন্দুধর্ম কেবল মৃত্তিপূজা করেনা, সকল দেবতার পূজার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী। তাঁর বক্তৃতা থেকে ইউরোপের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উত্তুন্ত হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পর বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে বিশাল সমর্থন দেয়। তার জবাবে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। সবাইকে বিভেদ ভূলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, ‘শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরূষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ।’

বিবেকানন্দ বলতেন – নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেধের সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। তিনি দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য সর্বদা চিন্তা করতেন। তাদের দারিদ্র্য দূর করা এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা ভাবতেন। তাঁর শুরুদের বলতেন ‘খালি পেটে ধর্ম হয় না’। তাই তিনি সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচানোর কথা ভাবতেন। তিনি বলেছেন, ‘দরিদ্রদের মুখে অন্ন জোগাতে হবে, শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। আগে অন্ন, তারপর ধর্ম।’

বিবেকানন্দের মহান বাণী হলো ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা।’ ঈশ্বরসেবার আগে তাঁর সৃষ্টি জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। জীবকে জীবজ্ঞানে সেবা করলে তা হবে দয়া, আর আত্মজ্ঞানে সেবা করলে হবে প্রেম। তাই তিনি বলেছেন:

বহুজনে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?  
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

তাঁর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে স্থাপিত হয়েছে শত-শত সেবাশ্রম, সেবাকেন্দ্র ও বিদ্যাশ্রম। এসবের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

বিবেকানন্দ জীবসেবার কথা শুধু মুখেই বলতেন না, স্বয়ং কাজেও করে দেখিয়েছেন। ১৮৯৮ সনে কোলকাতায় একবার মহামারী আকারে প্রেগ দেখা দেয়। তখন তিনি দার্জিলিঙ্গে ছিলেন। প্রেগের কথা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কোলকাতায় চলে আসেন এবং শুরুভাবে নিয়ে রোগীদের সেবায় লেগে যান।

বিবেকানন্দ নারীদের উন্নয়নের ব্যাপারে ধুবই সোচার ছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘মেয়েদের প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে। শিল্প-ব্যবসা-কৃষি কর্মা-১১, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি

শেখার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ মেয়েদের থাকতে হবে।' তিনি নারীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতেন। তাই তিনি বলতেন – শক্তিকে বাদ দিয়ে বিশ্বের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। তাঁর মতে প্রত্যেক পুরুষের কাছে স্ত্রী ছাড়া অন্য সব নারীরই মায়ের মতো হওয়া উচিত। তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়ে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন। আমেরিকায় হিন্দু-বিধবাদের অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে যে অর্থ উপর্জন করেছিলেন, তাঁর একাংশ তিনি বরানগরে হিন্দুবিধবাশ্রমে প্রদান করেন। এই আশ্রমে বিধবাদের জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষা দেয়া হতো। তিনি নারীদের সন্ধান গ্রহণেরও পক্ষপাতি ছিলেন।

বিবেকানন্দ তৎকালীন হিন্দুসমাজের ঘৃণ্য প্রথা অস্পৃশ্যতার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তিনি সকলকে অমৃতের সন্তান বলে মনে করতেন। তাঁর এই মনোভাব দ্বারা মহাআশ্চৰ্ণ গান্ধীও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট লেখকও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর শুরুদের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য কোলকাতার বরানগরে 'রামকৃষ্ণ মঠ' স্থাপন করেন। পরে স্থাপন করেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঙ্গার পঞ্চম পাড়ে স্থাপন করেন মঠের স্থায়ী কেন্দ্র। সাধারণভাবে এটি 'বেলুড় মঠ' নামে পরিচিত। বর্তমানে এটিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কেন্দ্র।

#### বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী

১. আমার ঈশ্বর কোনো দূর গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, অজ্ঞতাবশত যাকে আমরা মানুষ বলি সে-ই আমার ঈশ্বর।
২. পরাধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশূন্য হলেই চলবে না, আমাদেরকে ঐ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।
৩. সৎ হওয়া এবং সৎ কাজ করা – তাঁর মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে সে-ই ঠিক ঠিক ধার্মিক।
৪. মানুষের মহৎস্তুত পরিচয় তাঁর চরিত্রে, বৃত্তিতে নয়।
৫. পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বর ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ।
৬. ভূলো না – নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথের তোমার রক্ত, তোমার ভাই।
৭. দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর – এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবাই পরম ধর্ম বলে জানবে। দরিদ্রদেবো ভব। মূর্খদেবো ভব।

**একক কাজ:** তোমার জানা জীবসেবামূলক একটি বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ: অস্পৃশ্যতা, মূর্তিপূজা, গোত্র সম্মান, অনুপ্রাণিত।

### পাঠ ৯, ১০ ও ১১ : ঠাকুর নিগমানন্দ

মেহেরপুর জেলার অস্তর্গত কুতুবপুর একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন ভূবনমোহন ভট্টাচার্য নামে একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁর স্তৰীর নাম মাণিক সুন্দরী। উভয়ই নিয়মিত পূজা-পার্বণ ও ব্রতাচার নিয়ে থাকতেন।

মাণিক সুন্দরীর পিত্রালয় মেহেরপুরেরই অস্তর্গত রাধাকান্তপুর থামে। এই গ্রামেই ১২৮৭ সালের (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) বুলন পূর্ণিমার রাতে মাতুলালয়ে ঠাকুর নিগমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চোখদুটি ছিল পদ্ম বা নলিনীর মতো দেখতে। তাই তাঁর নাম রাখা হয় নলিনীকান্ত। নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য।



নলিনীর বয়স তখন সাত বছর। পিতা ভূবনমোহন ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খেলাধুলা ও দুরস্তপনার পাশাপাশি নলিনী পড়াশোনায়ও মেধার পরিচয় দিয়ে আসছিলেন শুরু থেকেই। তাই প্রাথমিকের পাঠ তিনি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন দারিয়াপুর গ্রামের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। থাকতেন রাধাকান্তপুরে মাতুলালয়ে।

একাদশ বছর বয়সে নলিনীর উপনয়ন হয়। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মভাব জেগে ওঠে। তিনি ত্রিসংজ্ঞ্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করতেন। কিন্তু বয়স বাঢ়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তিনি জাতিভেদ মানেন না। ব্রাহ্মণের মিথ্যা অহংকারকে ঘৃণা করেন। তবে প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করেন। যুক্তি দিয়ে তিনি নিজের মতকে সমর্থন করেন। কিন্তু নিজের মত ঠিক নয় বুঝতে পারলে তিনি নির্ধিধায় পরাজয় স্বীকার করেন। ধর্মের নামে ভঙ্গমিকে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করেন।

সাহিত্যস্ত্রাট বক্ষিমচন্দ্র ছিলেন সম্পর্কে নলিনীর দাদামশাই। তিনি নলিনীকে খুব স্নেহ করতেন। নলিনীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে কথা হতো। এর মধ্য দিয়ে নলিনী বক্ষিমচন্দ্রের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন। নলিনীর ইংরেজি পরীক্ষার আগেই বক্ষিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পর মা মাণিক সুন্দরীও পরলোক গমন করেন। এ-দুটি ঘটনা নলিনীর মনে গভীর রেখাপাত করে। মানব জীবনের নশ্বরতা তাঁকে ভীমণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নলিনীর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেব-দ্বিজে, ধর্মে-কর্মে, শাস্ত্রাদিতে তাঁর বিশ্বাস উঠে যায়। ভগবানে বিশ্বাস নেই। যৌক দেখা দেয় যাত্রা-থিয়েটার আর সাহিত্যচর্চায়। পাশাপাশি চলে জনসেবার কাজ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বাড়ি গিয়ে রোগীর সেবা করেন। কোনো বাড়িতে

মৃতদেহ সৎকারে লোক পাওয়া না গেলে নলিনী সেখানে সাথেই এগিয়ে যান। এ নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পিতা ভূবনমোহনকে অনেক নিন্দাবাক্য শুনতে হয়।

নলিনীর এই আচরণ দেখে ভূবনমোহন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য তিনি তাঁর বিবাহ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যথাসময়ে নলিনীর বিয়ে হয়ে যায়। কন্যা হালিশহরের বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সুধাংশুবালা। নলিনীর বয়স তখন ১৭ এবং সুধাংশুবালার ১২।

বিয়ের কিছুদিন পর নলিনীকান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাই পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে কিছুদিন পড়ার পর তিনি ঢাকার সার্কে স্কুলে ভর্তি হন। কারণ, এখান থেকে পাস করলে সহজেই ঢাকরি পাওয়া যায়। এখান থেকে পাস করার পর তিনি স্থগামে ফিরে যান এবং কুতুবপুর স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর কিছুদিন পর ওতারসিয়ারের ঢাকরি নিয়ে দিলাজপুর সরকারি অফিসে যোগদান করেন। কিন্তু এ ঢাকরিতে মিথ্যাচার করতে হয় বলে তিনি ঢাকরি পরিবর্তন করেন। এরপর আরেক দফা ঢাকরি পরিবর্তন করে তিনি কোলকাতার জনৈক জমিদারের এস্টেটে ঢাকরি নেন। সেই উপলক্ষে তিনি তখন কোলকাতায় ছিলেন। স্ত্রী সুধাংশুবালা তখন অস্তসন্ধা। তাই তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মে। কয়েকদিন পর কন্যা সন্তানটি মারা যায়। স্ত্রীও বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর মারা যান। এতে নলিনী খুব আঘাত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উঠে যায়। তিনি ঢাকরিও ছেড়ে দেন। প্রায়শই তিনি স্ত্রী সুধাংশুবালার ছায়ামূর্তি দেখতে পান। তিনি এর রহস্য জানতে চান। পরলোক সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। এমনি সময় একদিন কোলকাতায় পূর্ণানন্দ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পূর্ণানন্দ বলেন, স্ত্রীমাত্রেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ। তাঁকে পেতে হলে সাধনা করতে হবে।

এরপর নলিনী যান বীরভূমের মহাতীর্থ তারাপীঠে। সেখানে ছিলেন মহাসাধক বামাক্ষেপা। তিনি তাঁকে তারামন্ত্রে দীক্ষা দেন। আর বলেন তারামায়ের সাধনা করতে। নলিনী একমনে সাধনা করতে লাগলেন। অবশেষে মা স্ত্রীরূপে দেখা দিলেন। কিন্তু নলিনী তাঁকে ধরতে গেলেই তিনি মিলিয়ে যান। এ-কথা তিনি বামাক্ষেপাকে খুলে বললেন। বললেন, ‘এ দেবী কে? আমিই বা কে?’ বামা বললেন, ‘এ তত্ত্ব জানতে হলে তোকে জ্ঞান সাধনা করতে হবে। জ্ঞানীগুরুর সন্ধান করতে হবে।’

বামাক্ষেপার কথামতো নলিনী জ্ঞানীগুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে পুক্ষরতীর্থে এসে জ্ঞানীগুরুর সন্ধান পান। তিনি হলেন সচিদানন্দ পরমহংস। তাঁর আশ্রমে থেকে নলিনী বেদ-বেদান্ত, দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। শুরু তাঁকে বৈদিক সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় ‘স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী’। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে বেড়ান, যেমন- কাশী, কামাখ্যা, হিমালয়, কোকিলামুখ ইত্যাদি। এসব জ্যোতির্গায় তিনি যোগ সাধনা করেন।

এরপর জনহিতার্থে ঠাকুর নিগমানন্দ সদ্ধর্ম প্রচার শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ব্রহ্মচর্য সাধনার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি উপলক্ষ্মি করতে পেরেছিলেন যে, প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন না করলে পরবর্তী জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারবে না। পাশাপাশি তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠনের শুরুও জোর দেন। এছাড়া ঠাকুর কৃষিকর্ম, গো-সেবা, অনাথ আশ্রম, খায়ি বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও জনসেবার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য ‘আর্য-দর্পণ’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন, যা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সনাতন ধর্মের মুখ্যপত্র হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ঠাকুর ‘যোগীগুর’, ‘জ্ঞানীগুর’, ‘তাত্ত্বিক শুরু’, ‘প্রেমিক শুরু’, ‘ব্রহ্মচর্য সাধন’, ‘বেদান্তবিবেক’, ‘তত্ত্বমালা’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমেও তাঁর আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ছিল – ‘শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ’, অর্ধাং সেবা ও ভক্তির পথে অবৈত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। এই আদর্শ প্রচারে বাংলার চারদিকে চারটি সারস্বত আশ্রম সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য সহস্রাধিক সারস্বত সম্প্রদায় আছে।

**তত্ত্ব, জ্ঞান, যোগ ও প্রেম** – এই চতুর্সাধনে সিদ্ধ মহাসাধক ঠাকুর নিগমানন্দ ১৩৪২ সালের (১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ন ১:১৫ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

### ঠাকুরের কয়েকটি বাণী

১. আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন প্রতিষ্ঠাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন খ্যাগণ প্রবর্তিত পথে চলে তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও। শুধু সন্ধ্যাসী হয়ে বনে গেলেই ভগবান লাভ হয় না। গৃহে থেকে আদর্শ গৃহী হয়ে ধর্ম সাধনা করলেও ভগবান লাভ হয়।
২. আত্মজ্ঞান কিংবা নারায়ণ জ্ঞানে যথাসাধ্য জীবসেবা কর। পরের উপকার করতে কৃষ্ণিত হয়ে না। এই প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না। জীবসেবাই কলির একমাত্র ধর্ম।
৩. নর-ই সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং নরের সেবা ব্যতীত নারায়ণের কৃপা হয় না। তাই গার্হস্থ্য ধর্মের এত মাহাত্ম্য। আপন প্রাণকে বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে মেলাতে হবে। তবেই ভগবান যেচে দয়া করবেন। নতুন্বা মুখের প্রার্থনায় তাঁর সিংহাসন টলে না।
৪. কেবল কতগুলো কর্মানুষ্ঠানে জীবনে পূর্ণতা লাভ হয় না। ভগবানে আত্মনির্ভর করতে অভ্যাস কর। কীট থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত একই ভগবানের বিকাশ জেনে সর্বভূতের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ কর। মানব জীবন ধন্য হবে। পবিত্র আনন্দের অধিকারী হবে।

ঠাকুর নিগমানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, যিন্হা অহকার কারো পক্ষেই ভালো নয়। জাতিভেদ স্থানে বিশ্বালা সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তালোবাসতে হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি মানুষের বাস্তব জীবনেরও উন্নয়ন থেঝোজন। আমর্ণ শৃঙ্খল হয়েও ভগবানকে লাভ করা যাব। মারাঙ্গভানে মানুষকে সেবা করতে হবে। জীবনেরাই কলির একমাত্র ধর্ম। সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। সকল জীবের সেবা করা যানেই ঈশ্বরেরও সেবা করা। তাই সর্ব জীবের সেবার নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

ঠাকুর নিগমানন্দের এই শিক্ষা আমরা সব সবচ মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে পালন করার চেষ্টা করব।

**মনীষ কাজ:** ঠাকুর নিগমানন্দের জনহিতকর কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

নকুল শক্তি: কামাখ্যা, সারথক, আর্কিট।

### পাঠ ১২ ও ১৩ : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পাবনায় পদ্মাৰ জীৱবৰ্তী একটি গ্রাম হিমাইতপুৰ। সেই গ্রামে ১২৯৫ সালের ৩০এ তাৰ (১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বৰ) অনুকূলচন্দ্রের জন্ম। শিষ্ঠা শিবচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী এবং মাতা মনোযোহিণী দেৱী।

হিমাইতপুৰেই অনুকূলচন্দ্রের শৈশব, বাল্য ও কৈশোৱ অভিজ্ঞান হয়। হিমাইতপুৰ পাঠ্যালাভ তিনি সেখাপড়া তত্ত্ব করেন। সেখানকার পাঠ শেখ হলে তিনি পাবনা ইনসিটিউটে ভর্তি হন। এখানে নবম শ্রেণি পৰ্যন্ত পড়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সৈহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রৱেশিকা পৰীক্ষার জন্য মনোনীত হন। কিন্তু একজন সহপাঠী পৰীক্ষার ক্ষিসের টাকা বোগাঢ় করতে পৱেন নি তনে তাঁকে তিনি নিজের টাকা দিয়ে দেন। কলেজ ঐতো তাঁৰ পৰীক্ষা দেমা হয়নি। পৱেৰবাৰ তিনি প্রৱেশিকা পৰীক্ষার পাস কৰেন। এৱলৰ মাজেৰ ইজহার তিনি কোলকাতার ন্যাশনাল স্টেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁসেৱ সংসারে আৰ্দ্ধিক অন্টল ছাড়িল। তাই অনেক কষ্ট কৰে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যাইলোন। একদিন প্রতিবেশী এক ভাস্তুৰ হেমতকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় পুনৰ্ভূত তাঁকে একটি বাকল দেন। তা দিয়ে তিনি কুলি-মজুমাদেৱ সেবা তত্ত্ব কৰেন। সেৱাৰ আনন্দেৱ মধ্য দিয়ে যা আৱ হুকো তাঁৰ মিল চলে দেত।

অনুকূলচন্দ্র জ্ঞানৰ হজো নিজ গ্রামে কিয়ে আসেন। সেখামে তিনি চিকিৎসা কৰ্ম তত্ত্ব কৰেন। এতে তাঁৰ অনুকূলপূৰ্ব সাফল্য আসে। বিস্তু তিনি উপলক্ষ কৰালৈল, মানুষেৰ দুঃখেৰ হারী সমাধান কৰতে হলে কেবল শাস্ত্ৰীয় চিকিৎসা নহ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও দৱকাৰ। কাৰণ শৰীৰেৰ সঙ্গে মন ও আত্মাৰ নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই তিনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসাও তত্ত্ব কৰালৈল।



অনুকূলচন্দ্র ছিলেন সমাজের অসহায়, অবহেলিতদের বক্তু। তাদের নিয়ে তিনি কীর্তনদল গঠন করেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মানসিক শান্তির বিধান করেন। অনেক শিক্ষিত তরুণও এগিয়ে আসেন। তাঁর এই কীর্তন এক সময় একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। সবাই তাঁকে তখন ডাক্তার না বলে বলত ‘ঠাকুর’। সেই থেকে তিনি ‘ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র’ নামে পরিচিত হন। তাঁর খ্যাতি ক্রমশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ যাতে সৎপথে থাকে, সৎ চিন্তা করে সেজন্য ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হিমাইতপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সৎসঙ্গ আশ্রম। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করতেন। দলে-দলে লোক তাঁকে শুরু মেনে এই সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। তিনি এই সঙ্গের মাধ্যমে ধর্মের সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটান। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সুবিবাহ – এই চারটি ছিল আশ্রমের মূল ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপত্র, সন্ধ্যাস – সনাতন আর্য জীবনের এই চারটি শুরু জীবন যাপনে তিনি সকলকে অভ্যন্ত করে তোলেন। অনুকূলচন্দ্র লোকহিতার্থে প্রাচীন খবিদের আদর্শে তপোবন বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, পাবলিশিং হাউজ, ছাপাখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি মানুষ জাগতিক জীবনেও উপকৃত হয়। মহাআন্তরীণ গাঙ্কী সৎসঙ্গের এই কর্মকাণ্ড দেখে অত্যন্ত মুক্তি হন এবং এর প্রশংসা করেন।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র বিহারের দেওঘরে যান এবং সেখানে সৎসঙ্গের আদর্শে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ভারত ভাগ হলে তিনি আর ফিরে আসেন নি। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারি ৮১ বছর বয়সে তিনি দেওঘরেই দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্যসম্পদায় এবং সৎসঙ্গের কর্মকাণ্ড উভয় বাংলার নানা অঞ্চলে আজও সক্রিয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর আশ্রম ও কার্যালয় আছে। এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেয়া হয়।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ৪৬ খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে-সবের মধ্যে ‘পুণ্যপুঁথি’, ‘অনুশ্রুতি’, ‘চলার সাথী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা ছিল: মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। যে যে-সম্প্রদায়েরই হোক-না-কেন, মনে রাখতে হবে স্মৃতির এক, ধর্মও এক। সংসারে থাকবে, মন রাখবে ভগবানে। শুধু লেখাপড়া করলেই বড় হওয়া যায় না, আচার-ব্যবহারও জানতে হয়। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই শিক্ষা আমরা সব সময় স্মরণে রাখব এবং মেনে চলব।

**একক কাজ:** ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

**নতুন শব্দ:** আত্মিক চিকিৎসা, লোকহিতার্থ, পুণ্যপুঁথি, অনুশ্রুতি।

## পাঠ ১৪ ও ১৫ : মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ীর জন্ম ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০এ  
এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া  
গ্রামে। পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, মা  
মোক্ষদা সুন্দরী। বিপিনবিহারীর পৈতৃক  
নিবাস ছিল বিদ্যাকুটো।

আনন্দময়ীর আসল নাম নির্মলা সুন্দরী।  
গ্রামের পাঠশালায় নির্মলার পড়াশোনা শুরু  
হয়। কিন্তু পড়াশোনা বেশিদুর এগোয়ানি।  
ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে দিব্যভাবের  
প্রকাশ ঘটে। হরিনাম কীর্তন হলে তিনি  
আকুল হয়ে শুনতেন।



বাংলা ১৩১৫ সালের (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫এ মাঘ নির্মলার বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স তের শেষ  
হয়ে চৌক বছরে পড়েছে। স্বামী রমণীমোহন চক্রবর্তী। বাড়ি বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামে। বিয়ের  
পর নির্মলা স্বামীর নাম দেন ভোলানাথ।

ভোলানাথ বাজিতপুরে সেটেলমেন্ট বিভাগে চাকরি করেন। ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ) নির্মলা  
স্বামীর কর্মসূলে যান। তাঁর মধ্যে ক্রমশই দিব্যভাব প্রকটিত হতে থাকে। কোথাও কৃষ্ণনাম শুনলে  
কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আকুল হয়ে যান। একবার ভূদেবচন্দ্র বসুর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে:

হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণাদবায় নমঃ ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

নির্মলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কীর্তন শুনতে-শুনতে এক সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তখন  
তাঁর দেহ থেকে দিব্য আলো প্রকাশিত হচ্ছিল। সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার  
সুস্থ হয়ে উঠলেন। এভাবে নির্মলার মধ্যে মহাভাবের শুরু। সাধারণ মানুষের অজ্ঞাতে তাঁর শরীরে  
চলতে থাকে সাধন-ভজনের নানারকম লীলা। দিব্য জ্যোতির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর সমস্ত শরীর।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ভোলানাথ চলে আসেন ঢাকার শাহবাগে। তখনকার নবাবের বাগানের তত্ত্বাবধায়কের কাজ নিয়ে। সঙ্গে নির্মলাও আসেন। এই শাহবাগে মা কালীর মন্দিরে নির্মলার মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রকটিত হয়। তখন থেকেই তিনি ‘মা আনন্দময়ী’ নামে খ্যাত হন। এখানেই তাঁর সাধন-ভজন চলতে থাকে। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিঙ্গেশ্বরীতে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাঁর আদি আশ্রম।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে মা আনন্দময়ী স্বামীসহ চলে যান দেরাদুনে। ফলে তাঁর লীলাক্ষেত্র ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয় উত্তর ভারতে। সেখানে তাঁর দিব্যভাবের পরিচয় জানাজানি হলে অনেকে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। ভারতের অনেক জ্ঞানী-গুণী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ হয়েছে। এমনকি পশ্চিত জওহরলাল নেহেরু, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

মা আনন্দময়ী নিজে ভগবৎপ্রেমী ছিলেন। তাই ভারতের জনগণকেও ভগবৎমুখী করার কাজে তিনি অক্রান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি উপমহাদেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছেন। প্রাচীন ভারতের অনেক লুঙ্গ তপোবন ও তীর্থস্থান তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মস্থল, সহস্র ঋষির তপোভূমি নৈমিত্যারণ্যকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। এখন সেখানে কীর্তন, নাচ, গান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চলছে। এভাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের সুষ্ঠু, লুঙ্গ ধর্মস্থানকে জাগ্রত করেছেন। সেখানে যাগ-যজ্ঞ, মন্দির, বিঘ্ন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষকে সনাতন ধর্মের ভাবধারায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন। মানুষের মনকে ভগবৎমুখী করার জন্য অশেষ প্রেরণা দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের রমনা ও খেণড়ার দুটি আশ্রমসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ২৫টি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এটি মায়ের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। মা আনন্দময়ী বলতেন, ‘যে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় থেকেই কর্ম করে যাও। নাম কর, শুধু নাম। নামেই সব হয়।’

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭এ আগস্ট মা আনন্দময়ী পরলোক গমন করেন। হরিদ্বারে কণ্ঠল আশ্রমে গঙ্গার তীরে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

মা আনন্দময়ীর জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সর্বদা ভগবানের নাম নিতে হবে। তাঁর নামে সব কিছু করতে হবে। কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা চলবে না। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। মায়ের এই শিক্ষা আমরা মেনে চলব।

**একক কাজ: ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ীর অবদান সম্পর্কে লেখ।**

**নতুন শব্দ:** দিব্যভাব, পুনরুজ্জীবিত, সমাধিস্থ।

## পাঠ ১৬ ও ১৭ : শ্রীলভক্তিবেদান্তস্থামী প্রভুপাদ



শ্রীলভক্তিবেদান্তস্থামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের উভয় কোলকাতার হ্যারিসন রোডের ১৫১ নং বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌরমোহন দে এবং মাঝের নাম রঞ্জনী। প্রভুপাদের প্রকৃত নাম অভয়চরণ দে।

গৌরমোহন এক জ্যোতিষীকে দিয়ে পুত্রের কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি একটি ভবিষ্যঘাণী করেছিলেন। এই শিশু ৭০ বছর বয়সে সম্মুখ পাড়ি দেবে। বিদেশ যাবে। একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে এবং ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর এই ভবিষ্যঘাণীর প্রায় সবটাই সত্যে পরিপন্থ হয়েছে। অভয়চরণ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে

আমেরিকা যান। সেখানে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। ক্রমশ তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংষ্দ', সংক্ষেপে যা 'ইসকন' নামে পরিচিত। আর তিনি পরিচিত হন 'শ্রীলভক্তিবেদান্তস্থামী প্রভুপাদ' নামে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি শতাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌরমোহন দে ছিলেন একজন সম্মান্ত বস্ত্র-ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। নিয়মিত কৃষ্ণনাম জপ করতেন। যথাপ্রত্যু শ্রীচৈতন্য ছিলেন তাঁর আদর্শ। চৈতন্য প্রবর্তিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ছিল তাঁর সাধনার মূল যত্ন। তিনি নিয়মিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করতেন। তিনি চাইতেন ছেলে অভয়চরণও তাঁর মতো বৈষ্ণব হোক। এজন্য তিনি তাঁকে নিয়মিত রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে নিয়ে যেতেন। বালক বয়সেই তাঁকে মৃদঙ্গ বাজানো সেখান। ভজন, কীর্তন ইত্যাদি শেখায় উৎসাহ দেন।

অভয়চরণের মা রঞ্জনী দেবী ছিলেন গোঢ়ীয় বৈষ্ণব পরিবারের কল্যা। তাই তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণব ভাবের প্রকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন পজিত্রতা ও ধর্মপরায়ণ একজন আদর্শ জ্ঞী ও জননী। বালক অভয়চরণ দেখতেন, তাঁর মা কি রকম সরলতা সহকারে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতেন। পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান করতেন। মাঝের এই ভক্তি, সরলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা বালক অভয়চরণের মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

অভয়চরণ কোলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। এ সময় তাঁর বিয়ে হয়। স্ত্রীর নাম রাধারাণী দেবী। কিন্তু রাধারাণী পিত্রালয়েই অবস্থান করছিলেন, অভয়চরণের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছিল। অভয়চরণের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছিল। একই কলেজে এক ক্লাস ওপরে পড়তেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে অভয়চরণ মুগ্ধ হন। কিন্তু সরাসরি আন্দোলনে যোগ দেন না। তবে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা অনীহার ভাব সৃষ্টি হয়। এর চেয়ে তিনি ভারতের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর মঙ্গলজনক মনে করেন।

মহাআন্ত্রিক গান্ধীর আন্দোলনের প্রতিও অভয়চরণ একটা আকর্ষণ অনুভব করতেন। মনোযোগ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা- বিবৃতি শুনতেন এবং পাঠ করতেন।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অভয়চরণ সাফল্যের সাথে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এ-সময় পাঞ্চাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শতশত নিরান্ত-নিরীহ মানুষকে ইংরেজ সৈন্যরা হত্যা করে। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী ইংরেজদের সবকিছু বর্জনের আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভয়চরণ তাঁর ডিপি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনার পর পিতার ইচ্ছায় তিনি একটি ওয়েথ কোম্পানিতে চাকরি নেন এবং ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই কাজেই সপরিবারে এলাহাবাদ চলে যান।

এলাহাবাদে এসে অভয়চরণের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। এখানে তিনি শ্রীলভক্ষিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে অভয়চরণের ইতঃপূর্বেও (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) কোলকাতায় একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অভয়চরণ তখন স্বদেশী আন্দোলনের ভাবধারায় উদ্ভুক্ত ছিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন তাঁকে বলেছিলেন, ‘এসব আন্দোলনের চেয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আন্দোলন অনেক কার্যকর। ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ কীর্তন অতি সহজেই সকল শ্রেণির মানুষকে কাছে টানতে পারে। সংসারের সমস্ত রকম দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে শান্তি দিতে পারে। কলিযুগে জীবোদ্ধারের এটাই একমাত্র পথ।’ সেই একই কথা ঠাকুর এবারও অভয়চরণকে বললেন। অভয়চরণ এবার শুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কাজ শুরু করে দিলেন।

অভয়চরণ শুরুর উপর্যুক্ত ও নিজের আদর্শ প্রচারের জন্য Back to Godhead নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর তিনটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি প্রথম দুটির ভাষ্য রচনা করেন। সবার কাছেই তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। তিনি তাঁর পত্রিকা এবং গ্রন্থ তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত মনীষীদের কাছে পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাআন্ত্রিক গান্ধী, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণান, লালবাহাদুর শান্তী প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করেছেন। এরা তাঁর কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

অভয়চরণ এক সময় কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য চাকরি, সংসার সব ছেড়ে দেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এক পর্যায়ে তিনি বৃন্দাবনে যান। সেখানে তিনি সন্ধ্যাস-ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ‘অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্তস্বামী’। আরো পরে তিনি ‘শ্রীলভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ’ নামে খ্যাত হন।

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪এ নভেম্বর প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে ইহলীলা সংবরণ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বাস করতেন, সকল জাতির মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে পারলে কোনো জাতিভেদ থাকবে না। হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সবাই সবাইকে ভালোবাসবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ থেমে যাবে। তাঁর গুরু সরস্বতী ঠাকুরও তাঁকে এ-কথাই বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বাইরেও এই কৃষ্ণভাবনামৃত ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে এর মাধ্যমে বিশ্বভাত্ত গড়ে উঠবে। এ-কারণেই শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা যান। পরের বছর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠা করেন ‘আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংজ্ঞ’ (ইসকন)। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সংজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভুপাদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সংস্থাটি পরিচালনা করেন। তিনি শতাধিক মন্দির, আশ্রম, ক্ষুল ও কৃষ্ণকেন্দ্রের সমন্বয়ে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসকনের ৩৫০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে এর প্রধান মন্দির অবস্থিত। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি শহরেও ইসকনের মন্দির রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ প্রভুপাদ প্রবর্তিত এই মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হচ্ছেন। এভাবে তাঁরা একটি কৃষ্ণ-পরিবার তৈরি করে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় জীবনাচার পালন করছেন। ইসকনের মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণনামের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা। পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সৃষ্টি করা। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করা। জ্ঞানের আলো দ্বারা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করা। শিশুদের মধ্যে শিক্ষা দান করা। দরিদ্রদের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা প্রদান করা। গীতার দর্শন ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনা ও ইসকনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

**নতুন শব্দ:** মৃদঙ্গ, ক্ষটিশচার্চ, ইসকন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীয় জীবনাচার।

**পরিকল্পিত কাজ:** শিক্ষার্থী ওপরে বর্ণিত মহাপুরূষ ও মহীয়সী নারীদের ছবি সংগ্রহ করবে। তাঁদের শিক্ষাসমূহ একটা কাগজে লিখে পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখবে, যাতে সব সময় তা চোখে পড়ে। পাঠ্য বহির্ভূত অন্যান্য মহাপুরূষ ও মহীয়সী নারীদের সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করবে এবং তাঁদের ছবি সংগ্রহ করবে।

## অনুশীলনী

**শূন্যস্থান পূরণ কর:**

১. কৃষ্ণ সারাজীবনই ..... রক্ষা করেছেন।
২. দুর্বল শরীরে ..... হয় না।
৩. নলিনীর দাদামশাই ছিলেন .....।
৪. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি ..... চিকিৎসাও শুরু করেন।
৫. শাহবাগে মা কালীর মন্দিরে নির্মলার মধ্যে ..... প্রকটিত হয়।

**ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:**

বাম পাশে	ডান পাশে
১. জরাসন্ধ ছিলেন মগধের রাজা এবং	দুর্যোধনের আত্মীয়।
২. মতুয়া সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে	ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন।
৩. নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট	পুষ্করতীর্থে।
৪. নলিনী জ্ঞানী গুরুর সন্ধান পান	নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।
৫. অনুকূলচন্দ্র ডাঙ্কার হয়ে	কংসের শশুর। বিষ্ণুর অবতার হিসেবে জ্ঞান করে।

**নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১. পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
২. হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারীদের ‘মতুয়া’ বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
৩. ঠাকুর নিগমানন্দের পরলোক সম্পর্কে চর্চা করার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।
৪. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মানসিক চিকিৎসা শুরু করেছিলেন কেন?
৫. স্বামী বিবেকানন্দ নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন?

**নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

১. ‘শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধ ছিল অবশ্যস্তাবী’ – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।
২. শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
৩. ঠাকুর নিগমানন্দের দর্শন ব্যাখ্যা কর।
৪. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গের কর্মকাণ্ড বর্ণনা কর।
৫. ‘ইসকনের’ মূল উদ্দেশ্য ও সমাজে এর প্রভাব বর্ণনা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছিলেন কে?

- ক. ভীম
- খ. শ্রীকৃষ্ণ
- গ. বলরাম
- ঘ. বিদুর

২. ‘ধর্মচর্চার জন্য সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই’ – এ বক্তব্যটি –

- i. হরিচান্দ ঠাকুরের
- ii. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
- iii. মা আনন্দময়ীর

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও ii
- গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনমোহনবাবু জনদরদি ও ধার্মিক মানুষ, কিন্তু তিনি হন্দরোগে আক্রান্ত। হাটে ব্রক ধরা পড়েছে। ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ঢাকার সোহৃদাওয়াদী হাসপাতালে অপারেশনের জন্য ভর্তি হন। তিনি জক্ষ করলে তার পাশের রোগীর অবস্থা আরও খারাপ। কিন্তু ঢাকার অভিবে অপারেশন করতে পারছেন না। তিনি তাঁর নিজের অপারেশনের টাকা পাশের রোগীকে দিয়ে দেন।

৩. মনমোহনবাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে?

- ক. স্বামী বিবেকানন্দের
- খ. ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
- গ. হরিচান্দ ঠাকুরের
- ঘ. ঠাকুর নিগমানন্দের

৪. সাধন-ভজনে উক্ত সাধকের মর্মকথা হলো –

- ক. জীবসেবা করলে ঈশ্বরসেবা হবে
- খ. সংসারে থেকেও ভগবানের প্রতি মন রাখতে হবে
- গ. ভক্তির সঙ্গে হরির নাম নিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে
- ঘ. সেবা ও ভক্তির পথেই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।

**সৃজনশীল প্রশ্ন:**

১. কাননদেবী চাকরি, সাংসারিক কাজ ও ধর্মকর্ম সুনিপুণভাবে পালনের মাধ্যমেই ঈশ্বরসেবার আনন্দ পান। ব্যক্তিজীবনে তাঁর একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল বাড়িতে রাধাগোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর ইচ্ছাটি সার্থকভাবে পূরণ করার জন্য তিনি উপার্জিত অর্থে এলাকার পুরাতন মন্দির সংস্কার ও একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাধাগোবিন্দের পূজার ব্যবস্থা করেন। তিনি এলাকার মানুষকে দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করায় – এ বিষয়ে সচেতন করেন।
  - ক. মা আনন্দময়ীর পূর্বনাম কী?
  - খ. মা আনন্দময়ীর কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
  - গ. কাননদেবীর সংসারধর্ম পালনের সাথে মা আনন্দময়ীর কর্মসূল জীবনের কী বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
  - ঘ. ‘এলাকার মানুষের প্রতি কাননদেবীর ঈশ্বর আরাধনার বক্তব্য যেন মা আনন্দময়ীর বক্তব্যেরই প্রতিফলন’ – তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
২. বিধান ও কমল এলাকায় চিহ্নিত সন্তাসী ও চাঁদাবাজ। তাদের অত্যাচারে এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ। শ্যামল সৎ ও ধর্মপরায়ণ। এলাকায় তিনি অনেককেই ধর্মপথে ফিরিয়ে এনেছেন। বিধান ও কমলকে আইনের রক্ষকগণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইলে শ্যামল তাতে আপন্তি জানান। তিনি বিধান ও কমলকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিলেন। শ্যামল বিধানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারলেও কমলকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। কমল তার আগের কর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। একদিন অপরাধ সংঘটনকালে সে জনগণের হাতে ধরা পড়ে এবং নিহত হয়।
  - ক. জরাসন্ধ কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
  - খ. দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
  - গ. কোন নৈতিক শিক্ষার আলোকে শ্যামল বিধানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন?
  - ঘ. তোমার পঠিত ‘শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত’-এর শিক্ষার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
  - ঙ. ন্যায়ের পথে কমলের ফিরে না আসার কারণ তোমার পঠিত শ্রীকৃষ্ণের কংসবধের শিক্ষার আলোকে মূল্যায়ন কর।

## অষ্টম অধ্যায়

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যায়ে একজন ব্যক্তি বা জাতির আচরণ অন্য ব্যক্তি ও সমাজ বা জাতির প্রতি কেমন হবে, তা নির্ধারণের মাপকাঠিই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ কতিপয় গুণের সমষ্টিয়ে গড়ে উঠে, যেমন – মানবতাবোধ, সৎসাহস, ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম, অহিংসা প্রভৃতি।

আমরা জানি, নৈতিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় কে বা কোন জাতি কতটা সভ্য। ব্যক্তি ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। আবার নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বোঝা যায়, কে কতটা ধর্মীয় মহৎ আদর্শ পালন করে। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আমরা এ অধ্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা এবং ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা – এ মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করব। ব্যাখ্যা করব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ-সকল মূল্যবোধ গঠনের উপায়।

অহিংসা এবং সহিংসতা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এইডস রোগের কারণ, এর প্রভাব ও এর প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের আলোকে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা – এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা – এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- এইচআইভি/এইডসের কারণ, প্রভাব ও এর প্রতিরোধে করণীয় এবং এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে কীরুপ আচরণ করা উচিত, তা হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আলোচিত নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে উদ্বৃদ্ধ হব।

### ପାଠ ୧ : ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଧାରଣା

ଆମରା ଜାନି, ‘ନୀତି’ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହଛେ କୋନଟା ଭାଲୋ କାଜ ଆର କୋନଟା ମନ୍ଦ କାଜ ତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଭାଲୋ କାଜ କରାଯ ଉତ୍ସୁକ ହେଁଯା ଏବଂ ଭାଲୋ କାଜେ ଆତାନିଯୋଗ କରାର ପ୍ରବଗତା । ନୀତିର ସଙ୍ଗେ ଜାଡ଼ିତ ଯେ ବିଷୟ, ତାକେ ବଲା ହୁଏ ନୈତିକତା’ । ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ନୀତି-ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ।

ସତ୍ୟ କଥା ବଲା ଉଚିତ । ତାଇ ଆମରା ସବାଇ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କଥା ବଲବ । ଶୁରୁଜନଦେର ଭକ୍ତି କରା କର୍ତ୍ତ୍ୟ । ତାଇ ସବାଇ ଶୁରୁଜନଦେର ଭକ୍ତି କରବ, ତାଁଦେର ସେବା କରବ । ଈଶ୍ୱରଜାନେ ଜୀବେର ସେବା କରବ । କାରଣ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାଜାପେ ଈଶ୍ୱର ବିରାଜ କରେନ । ଏଭାବେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଥେକେ ଜୀବନ-ୟାପନେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମାଦେର ଯେ ନୈତିକତାବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାର ନାମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ।

ସକଳ ମାନୁଷେରଇ ଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥାକା ପ୍ରୟୋଜନ । ଯଦି କୋନୋ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ବା ସମାଜେ ଏଇ ଘାଟାଟି ଦେଖା ଦେଯ, ତାହୁଁ ଆମରା ବଲି, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେଛେ । ଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକାଶ ନାନାଭାବେ ଘଟତେ ପାରେ । ଯେମନ – ଝଣ୍ଟି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜଗৎ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି । ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ବା ଜାତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ – ଏ ତିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆମରା ପରିଚାଲିତ ହୁଏ । ମୂଲ୍ୟବୋଧକେ ଯଥନ ନୀତିର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ ଦେଖା ହୁଏ, ତଥନ ତାକେ ବଲା ହୁଏ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ । ‘ମୂଲ୍ୟ’ କଥାଟାର ଦ୍ୱାରା ମାନ ବା ପରିମାଣ ବୋାଯାଯ । ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଛେ ଜଗৎ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଧର ଏକଟା ଅଂଶମାତ୍ର । ସୁତରାଂ ଏହିକ ଥେକେ ‘ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ’ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକଟା ମାନକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । ଯେମନ – କୋନୋ ମାନୁଷକେ ଆମରା କେମନ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଖବ? ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଲେ: ନିଜେର ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ଅନେକ ସମୟ ପେଶା, ବିଭିନ୍ନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଭୃତି ବିବେଚନା କରେ କାରୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାରେର ମାନ ନିର୍ଧାରଣ କରି । ଏତେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟେ ନା । ଯଥନ ମାନୁଷକେ ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମାନ ଦିତେ ବିଭିନ୍ନ, ପେଶା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଧର୍ମମତ ବିବେଚନାଯ ନା ନିଯେ ସାମ୍ଯେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଉଛି, ତଥନ ତାର ମଧ୍ୟେ ଘଟେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶ ।

ଧର୍ମେର ସଙ୍ଗେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହେଛେ । ଧର୍ମସମ୍ମତ ଜୀବନ-ୟାପନେର ମଧ୍ୟେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ । ଆବାର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଙ୍କୁଳୋ ଧର୍ମେର ଅଙ୍ଗ ହିସେବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକଟି ଉଚ୍ଚମାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ । ଯିନି ଧାର୍ମିକ, ତାଁର ଆଚରଣେର ମଧ୍ୟେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକାଶ ଘଟତେଇ ହବେ । କାରଣ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଙ୍କୁଳୋ ଧର୍ମେର ଅଙ୍ଗ । ଏଥାନେ ଆମରା ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଆଲୋକେ ନ୍ୟାୟବିଚାର, ସଂସଙ୍ଗ, ସଂୟମ, ଅହିଂସା – ଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧଙ୍କୁଳୋ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନବ ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ:** ଉତ୍ସୁକ, ବିଭିନ୍ନ, ପ୍ରତିପାଳନ ।

## পাঠ ২ : ন্যায়বিচার

একসঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার নাম সমাজ। সমাজে সকলকে মিলেমিশে থাকতে হয়। কিন্তু নানা কারণে সমাজের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দেয়। মতের অমিল মনের অমিলে পরিণত হয়ে ঝগড়া পর্যন্ত গড়ায়। তখন দুপক্ষের মধ্যে কে সঠিক এবং কে সঠিক নয়, তা নির্ণয় করতে হয়। আবার দুপক্ষের মধ্যে কাউকে অভিযুক্ত করলেই তাকে দণ্ড দেয়া যায় না। আসলেই সে অপরাধী কিনা তা নির্ধারণ করতে হয়। কোনো বিষয়ে কে সঠিক এবং কে ভাস্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী না নিরপরাধ – এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে পদ্ধতি, তার নাম বিচার।

বিচারের সময় বিচারককে অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হয়। তাঁকে নির্ভুলভাবে বিচার করতে হয় কে সঠিক আর কে সঠিক নয়, কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী না নিরপরাধ। কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নীতি এবং ধর্ম বা আইনের আলোকে বিচার করার নাম ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচার সমাজকে সুপথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিচারক যখন বিচার করেন, তখন কে পুত্র, কে বন্ধু, কে আজীব্ব তা দেখেন না। তাঁকে ন্যায়-নীতি, ধর্ম বা আইন এবং যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। সেখানে শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগের কোনো স্থান নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য কষ্ট পেলেও বিচারককে ন্যায়বিচার করতে হয়। এ বিষয়ে কবিশঙ্কু  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন:

দণ্ডিতের সাথে দণ্ডাতা কাঁদে যবে

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

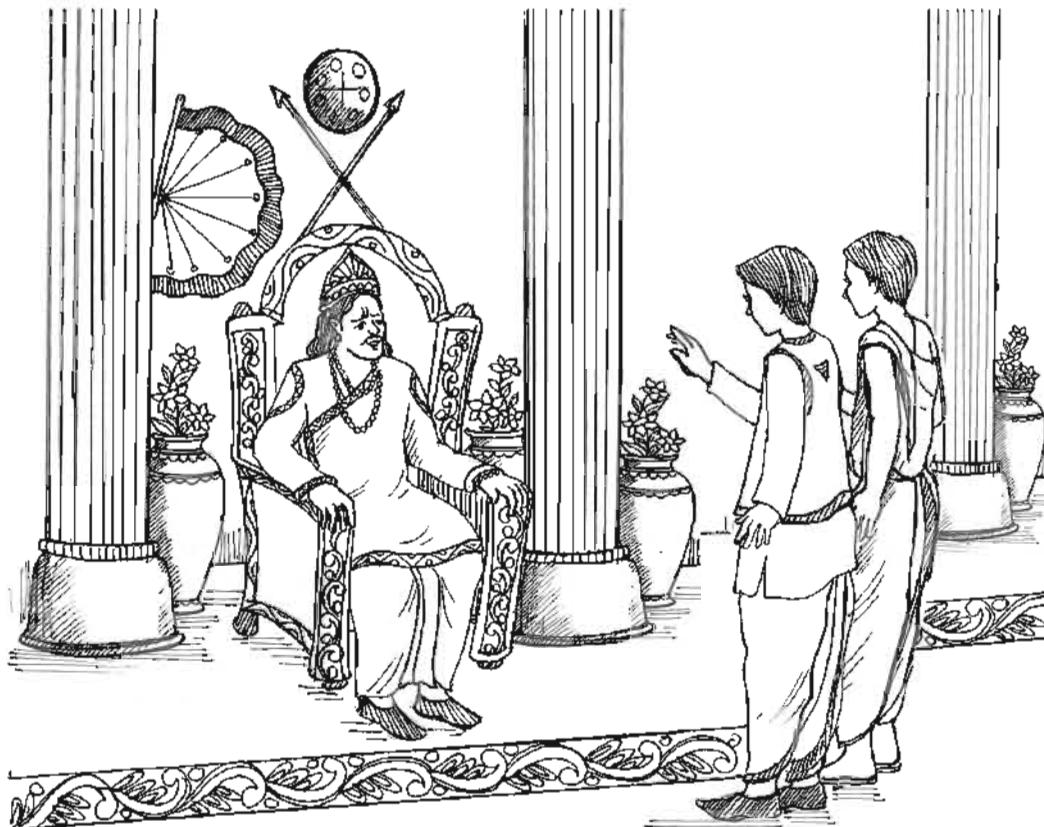
আমরা বিষ্ণুভক্ত প্রহৃদের কথা জানি। তিনি দৈত্যকুলে জন্ম নিয়েও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ন্যায়বিচারের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। এখন মহাভারত থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের একটি উপাখ্যান জানব।

## পাঠ ৩ : প্রহৃদের ন্যায়বিচার

বিষ্ণুভক্ত প্রহৃদ রাজত্ব করছেন। তাঁর সুশাসনে প্রজারা সুখেই আছে। তাঁর ছেলে বিরোচন। বিরোচন রাজপুত্র বলেই হোক আর নিজের চরিত্রের জন্যই হোক, কিছুটা উদ্ধৃত আর অহংকারী। তখন রাজধানীতে সুধসা নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাজপুত্র বিরোচনের সম্পর্ক ভালো

ଛିଲନା । ଏକବାର ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟେ କେ ଜ୍ଞାନେ ଓ ଗୁଣେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତା ନିଯେ ଦସ୍ତେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତଥନ ବିରୋଚନ ବଲେନ, ‘ଚଲ, ଆମରା ବିଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଓପର ଏ ବିଷୟେ ବିଚାରେ ତାର ଅର୍ପଣ କରି ।’

ତଥନ ସୁଧଶ୍ଵା ବଲେନ, ‘ରାଜ୍ଞୀ ହଲେନ ଶାସକ । ସୁତରାଂ ରାଜାର କାହେଇ ବିଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚିତ । ଚଲ, ଆମରା ତୋମାର ପିତା ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦେର କାହେ ଯାଇ । ଆଶାକରି ତିନି ନ୍ୟାୟବିଚାର କରବେନ ।’



ଦୁଃଖରେ ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦେର କାହେ ଗିଯେ ବିଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରଲେନ । ମହାରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସବ ଶବ୍ଦରେ ବଲେନ, ‘ରାଜପୁତ୍ର ବିରୋଚନ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ବୃଦ୍ଧିମାନ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉନ୍ନତ୍ୟ ଓ ଅହଂକାର ତାର ଚାରିତ୍ରକେ କିଛୁଟା ମଲିନ କରେଛେ – ସେମନ ଚାଁଦେର ରଯେଛେ କଲଙ୍କ ।’

**ବିରୋଚନ:** ପିତା!

**ପ୍ରହ୍ଲାଦ:** ହଁ ପୁତ୍ର । ବାଧା ଦିଖନା, ଆମାକେ ବଲତେ ଦାଓ ।

**ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଲତେ ଲାଗଲେନ:** ବ୍ରାହ୍ମଣକୁମାର ସୁଧଶ୍ଵା ଧର୍ମପରାଯଣ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂୟମେର ବଲେ

বলীয়ান। অহিংসা তার চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করেছে। সুতরাং তোমাদের দুজনের মধ্যে সুধৃষ্টি জানে ও গুণে অগ্রগণ্য।

পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে নিরপেক্ষভাবে প্রহাদের এ বিচার ন্যায়বিচারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

**একক কাজ:** প্রহাদের ন্যায়বিচারের শিক্ষা তুমি কীভাবে জীবনচরণে প্রয়োগ করবে?

#### পাঠ ৪ ও ৫ : সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গ হচ্ছে সৎলোকের সান্নিধ্য। সৎ লোকের সঙ্গে চলা-ফেরা, ওঠা-বসা কিংবা জীবন-যাপন। সৎসঙ্গ অত্যন্ত মধুর। সৎলোকের সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কারণ সৎলোক কারো ক্ষতি তো করেনই না, বরং পারলে উপকার করেন। তাই তো প্রবচন আছে, ‘সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ’।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বহুবার সৎসঙ্গের কথা ভক্তদের বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, সৎসঙ্গ মনকে পবিত্র করে, চরিত্রকে উন্নত করে এবং ভক্তিভাব জাগ্রত করে।

আমরা শুনেছি পরশ্পাথর লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে। তেমনি সৎসঙ্গ দুর্বৃত্তকেও সৎ ও মহৎ করে তোলে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনি বলছি:

#### সাধু ও শ্রীধর

ছায়াসুনিবিড় সুন্দর একটি গ্রাম। সেখানে বাস করত একটি কিশোর। নাম তার শ্রীধর। ভীষণ দুষ্ট ছিল সে। অল্পতেই রেগে যেত। বাগড়া লাগিয়ে মারামারি করত। এমনকি চুরি করতেও তার কোনো কুর্ষা ছিল না।



শ্রীধর একদিন ঘুরতে-ঘুরতে এল বদরিকা আশ্রমে। বিখ্যাত আশ্রম। কত মন্দির, কত ধর্মশালা, কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সেখানকার এক মন্দিরে গেল সে। দেখল, মন্দিরের বিগ্রহের গলায় ঝুলছে মুক্তার মালা। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর গভীর রাতে সুকৌশলে চুরি করল দেববিগ্রহের গলার সেই মুক্তার মালা। চুরি করে সেখান থেকে পালাল সে। সুন্দর মালাটি গলায় পরে সে পথ চলতে লাগল। ঘুরতে-ঘুরতে সে এল এক সাধুর আশ্রমে।

সাধু তাঁর সাধনার পাশাপাশি অন্যের সেবা-শুণ্ঘুরা করেন। বলেন, জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

সাধু শ্রীধরকে বললেন, ‘আমার একটা উপকার করতে পারবে, বাবা?’

শ্রীধর: ‘কী করতে হবে বলুন।’

সাধু তখন তাঁর বোলা থেকে একটি মুক্তা বের করে বললেন, ‘এ মুক্তাটি একজনের মালা থেকে খসে পড়েছে। মালার মালিক বদরিকা আশ্রম থেকে এসেছেন। তিনি চলছেন তাঁর দেশে। মুক্তাটি আমি তোমায় দিচ্ছি। পথ চলতে যদি দেখা হয়, তাহলে ওটা তাঁকে দিয়ে দিও।’

শ্রীধর মুক্তাটি হাতে নিল। তারপর নিজের মালায় হাত দিয়ে দেখল, মুক্তাটি তার গলার মালা থেকেই খসে পড়েছে। কখন কীভাবে পড়েছে, তা সে নিজেই জানে না।

সাধুকে প্রশ্ন করল শ্রীধর: ‘আপনি কেমন করে জানলেন যে আমার গলার মালা থেকেই মুক্তা খসে পড়েছে? কিন্তু মালাটি আমার নয়, আমি এটা বদরিকা আশ্রমের এক দেববিগ্রহের গলা থেকে ছুরি করেছি। এখন কী করব আমি?’

একথা বলেই সে কাঁদতে লাগল।

সাধু বুঝলেন, অসৎ হৃদয়ে সততার উদয় হয়েছে। তিনি শ্রীধরকে বললেন, ‘বাবা শ্রীধর, একবার পাপ করলে যে চিরকাল করতে হবে, তা নয়। এস, পুণ্যের পথে এস। দেবতার মালা ভূমি দেবতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস। তাহলে তিনিই তোমাকে ক্ষমা করবেন।’

সাধুর কথামতো শ্রীধর বদরিকা আশ্রমে গেল। কাউকে না জানিয়ে দেববিগ্রহের গলায় সেই মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিল। তারপর বাড়ি না গিয়ে ফিরে গেল সেই সাধুর আশ্রমে।

শ্রীধর সাধুর সঙ্গে থাকে। সাধু প্রতিদিন ভোরে স্নান করেন। শ্রীধরও প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান করা শুরু করল। সে লেগে পড়ল আশ্রমের নানা কাজে।

একদিন নদীতে একটি বিড়ালকে হাবুড়ুর খেতে দেখে সে ঝাপ দিয়ে পড়ল। তুলে আনল বিড়ালটিকে। আরেকদিন সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত এক ভিখারির শর কাঁধে করে শৃশানে নিয়ে গেল সে। এভাবে আর্তের সেবায় ব্রতী হলো শ্রীধর।

একদিন সে সাধুর অনুমতি নিয়ে বাড়ি গেল। তাকে দেখে কেউ চিনতে পারল না। পারবে কী করে? সে তো আর আগের শ্রীধর নেই। সে এখন তরুণ সাধক। তবে তার মা তাকে চিনলেন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ‘শ্রীধর, তুই!’

শ্রীধর: ‘হ্যাঁ মা, আমি। আমি তোমার শ্রীধর।’

দুর্বৃত্ত শ্রীধর নয়, চোর শ্রীধর নয়। সে এখন সৎ ও সেবাত্মী শ্রীধর।

সৎসঙ্গ এভাবে দুর্বৃত্তকে সৎ ও সেবাত্মী এক মহান মানুষে পরিণত করতে পারে। সৎসঙ্গের এমনই মহিমা।

**দলীয় কাজ:** শ্রীধরের শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর।

নতুন শব্দ: কৃষ্টা, ধর্মশালা, বিগ্রহ, শব, ব্রতী, দুর্বৃত্ত, সেবাত্মী।

#### পাঠ ৬ ও ৭ : সংযম

‘সংযম’ কথাটির অর্থ হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। শাস্ত্রে হিন্দুধর্মের যে দশটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, ‘দম’ ও ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’ সেগুলোর অঙ্গর্গত। ‘দম’ মানে দমন করা। ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’ মানে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। ইন্দ্রিয়ের দাবি অনুসারে না চলে তাকে নিজের ইচ্ছেমতো চালানোকেই বলে ‘ইন্দ্রিয়নিগ্রহ’।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। একটি ঘরে প্রচুর দই-মিষ্ঠি এনে রাখা হয়েছে। আমি এই ঘরে চুকলাম। ঘরে আর কেউ নেই। আমার লোভ হলো, ওখান থেকে একটা মিষ্ঠি তুলে খাই। কেউ তো আর দেখছে না। পরক্ষণেই চিন্তা হলো, মানুষ না-হোক সুশ্রে তো দেখছেন। তাছাড়া চুরি করা অনৈতিক কাজ। তাই আমি লোভকে দমন করলাম। এর মধ্য দিয়ে আমার জিহ্বা নামক ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ করা হলো। দম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে একসঙ্গে সংযম বলা হয়।

সংযম তপস্যার অংশ। তপস্যা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সফল প্রচেষ্টা। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ধর্মের চারটি ভিত্তি – তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য। তপস্যাই মূল ধর্ম। অপর তিনটি তপস্যার অংশ বলে বিবেচিত। তপস্যার আবার প্রকারভেদ আছে, যেমন – শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা ইত্যাদি। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃক্ষণা ইত্যাদি সহ্য করা, দেবতাদের পূজা

କରା, ଶୁରୁଜନଦେର ଶର୍କ୍ଷା କରା, ସରଲତା, ଅହିଂସା ପ୍ରଭୃତି ଶାରୀରିକ ତପସ୍ୟା । ସତ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଓ ହିତକର ବାକ୍ୟେର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଶାଙ୍କପାଠକେ ବଲା ହୁଯ ବାଚିକ ତପସ୍ୟା । ଆର ଚିତ୍ତର ପ୍ରସନ୍ନତା, ଅନିଷ୍ଟୁରତା, ବାକସଂୟମ ଓ ଆଆସଂୟମ (ନିଜେକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା), ଛଳ-ଚାତୁରୀ ନା-କରା ଇତ୍ୟାଦି ହଚେ ମାନସିକ ତପସ୍ୟା । ସୁତରାଂ ଦେଖା ଯାଚେ, ସଂୟମ ତପସ୍ୟାର ଅଂଶ ଏବଂ ଧର୍ମରୂପ ଅଙ୍ଗ ।

ସଂୟମ ଛାଡ଼ା ଜୀବନ ହାଲହୀନ ଲୌକା ବା ବଲାହୀନ ଘୋଡ଼ାର ମତୋ । କୋଣୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାକେ ନା । ଫଳେ ଜୀବନେ ଆସେ ଉଚ୍ଛ୍ଵଶିତା । ସଂୟମ ଆମାଦେର ଚରିତ୍ରକେ ଶୃଜଳାମଣିତ ଓ ମହଂ କରେ । ସୁତରାଂ ସଂୟମ-ସାଧନା ସିଦ୍ଧିଲାଭେର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ।

ସଂୟମ ବ୍ରକ୍ଷାଚର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ । ସଂୟମେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଶୁରୁଗୁହେ ଶିକ୍ଷାଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରାର ସମୟକାଳକେ ଶାନ୍ତ୍ରେ ବ୍ରକ୍ଷାଚର୍ଯ୍ୟ ବଲା ହେଯେଛେ । ସୁତରାଂ ସଂୟମ ହଚେ ଛାତ୍ରଜୀବନେର ଏକଟି ଅଙ୍ଗ ।

ସଂୟମ ନା ଥାକଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଯେ-କୋଣୋ କାଜ ପଣ ହଓଯାର ସମ୍ଭାବନା ଥାକେ । ତାଇ ତୋ ବଲା ହୁଯ, ସଂୟମ ହାରିଯେ ରେଗେ ଗେଲେନ ତୋ ହେରେ ଗେଲେନ ।

ସଂୟମକେ ସାରା ଜୀବନେର ସନ୍ତ୍ଵି କରତେ ହବେ । ଜୀବନେର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରେ ସଂୟମ ବଜାଯ ରାଖତେ ହବେ । ସଂୟମ ଜୀବନେର ସହାୟକ । ପରମତସହିକ୍ଷୁ ହତେ ହଲେଓ ସଂୟମେର ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ହବେ । ସଂୟମ ଓ ପରମତସହିକ୍ଷୁତା ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନ ଓ ସମାଜ-ଜୀବନ ପରିଚାଳନାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅପରିହାର୍ୟ ।

**ଏକକ କାଜ:** ଜୀବନେ ସଂୟମେର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସମ୍ପର୍କେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ।

**ନତୁନ ଶବ୍ଦ:** ଦମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟନିଧିହ, ତପସ୍ୟା, ଶୌଚ, ବାଚିକ, ହିତକର, ପ୍ରସନ୍ନତା, ବାକସଂୟମ, ଛଳ-ଚାତୁରୀ, ହାଲହୀନ, ବଲାହୀନ, ସିଦ୍ଧିଲାଭ ।

### ପାଠ ୮ : ଅହିଂସା

ଜୀବକେ ପୀଡ଼ନ ଓ ହତ୍ୟା ନା-କରାକେ ବଲା ହୁଯ ଅହିଂସା । ଯୋଗଶାନ୍ତ୍ରେ ଯମ (ସଂୟମ), ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ଓ ସମାଧି ନାମେ ଯୋଗେର ଆଟଟି ଅଙ୍ଗେର କଥା ବଲା ହେଯେଛେ । ଯମ ବା ସଂୟମ ଅହିଂସାର ଭିତ୍ତି ।

ସହିସତା ଅହିଂସାର ବିପରୀତ । ଜୀବକେ ପୀଡ଼ନ ବା ହତ୍ୟା କରାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକେ ବଲେ ସହିସତା ।

আমরা বিস্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশ ইত্যাদি পেতে চাই। আর এগুলো পাওয়ার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদের প্রতি সহিংস আচরণ করি। এ আচরণ অনৈতিক।

সহিংসতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়। অনেক সময় সহিংসতা থাণ হরণেরও কারণ হয়। সুতরাং সহিংসতা অধর্ম।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, যিনি নিষ্ঠুর আচরণ করেন না, কাউকে হিংসা করেন না, তিনি স্বর্গলোক জয় করতে পারেন (৪/২৪৬)। মনুসংহিতা থেকে অহিংসা সম্পর্কে আরও জানতে পারি যে, যিনি অহিংস, তিনি ধর্মকৃত্যসহ সকল সংকাজে সাফল্য লাভ করেন (৫/৪৫)।

শুধু মনুসংহিতায়ই নয়, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে অহিংসা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। অহিংসা যম (সংযম) নামক যোগের অংশ হিসেবে সাধনা বা তপস্যার সহায়ক, ইহলোকের অবলম্বন এবং মোক্ষলাভের অন্যতম প্রধান উপায়। তাই তো বলা হয় ‘অহিংসা পরম ধর্ম’। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীম বলেছেন, সকল জীবে অহিংসা পরম ধর্ম বলে জানবে।

হিংসার পরিণাম শুভ হয় না। কৌরবেরা পাঞ্চবদ্দের হিংসা করতেন। তাই তাঁদের পরিণাম শুভ হয়নি।

তবে অহিংসা বলতে কিন্তু কাপুরুষতা বা ভীরতাকে বোঝায় না। নির্বিচার ক্ষমাও বোঝায় না।

ন্যায়বিচার করে অপরাধীর শাস্তিদান হিংসা বলে গণ্য হবে না।

নিজের স্বার্থে পরপীড়ন, পরের ক্ষতি করার চেষ্টা বা কাউকে হত্যা করাকেই সহিংসতা বলা হয়েছে। সুতরাং পরপীড়ন না-করাই অহিংসা। অহিংসা ব্যক্তিকে মহান করে, সমাজে শান্তি আনে। অহিংসা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি অনুসরণীয় নৈতিক মূল্যবোধ।

নতুন শব্দঃ যোগশাস্ত্র, প্রবৃত্তি, ইহলোক, মোক্ষলাভ, কৌরব, পাঞ্চ-

পাঠ ৯ : পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার, সৎসঙ্গ, সংযম ও অহিংসা-এ মূল্যবোধগুলো অর্জনের উপায়

### ন্যায়বিচার

বিষ্ণুভক্ত প্রহাদের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার নামক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারি। মহাভারতে আছে, অযোধ্যার রাজা সত্যকামের পিতা রাজা দ্যুমৎসেন মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন অপরাধীকে সত্যকামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সত্যকাম তখন বলেছিলেন, অপরাধীর কার্য নীতিশাস্ত্র অনুসারে বিচার না করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া অন্যায়। সত্যকামের কথার মধ্যে ন্যায়বিচারের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা যদি ন্যায়বিচারের আদর্শ গ্রহণ করি, তাহলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ অর্জিত হবে।

### সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গের আদর্শও আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাই। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে আমরা যদি সৎসঙ্গ করি, তাহলে সৎসঙ্গের মূল্যবোধ অর্জিত হবে। সৎসঙ্গ কেবল পুঁথিগত বিদ্যার বিষয় নয়, তা আচরণীয় বিষয়, জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়।

### সংযম

সংযম অষ্টাঙ্গ যোগের অন্যতম। পরিবার ও সমাজের সকল সদস্য যদি প্রতিনিয়ত সংযত আচরণ করে, তাহলে পরিবার ও সমাজ-জীবনে সংযম নামক মূল্যবোধটি অর্জিত হবে। আর এ সংযত মানুষদের আচরণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচরণেও প্রতিফলিত হবে। সুতরাং সংযত আচরণের অনুশীলনই সংযম নামক মূল্যবোধটি অর্জনের উপায়।

### অহিংসা

অহিংসা অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ। অহিংসা ছাড়া ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। অহিংসাও অনুশীলনসাধ্য। কোনো অবস্থাতেই আমরা জীবকে হিংসা করব না। জীবকে ব্রহ্ম জ্ঞান করব। তাহলে আর মনে হিংসার জন্ম হবে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ অনুসরণ করে ক্রেতে ও ঈর্ষাকে দূরে রাখব। মনের মধ্যে সর্বদা থাকবে সন্তোষ। সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করব। প্রাণিতে অহংকারী হব না, অপ্রাণিতেও ভেঙ্গে পড়ব না। এভাবে জীবন-যাপন করলে অহিংস হবই।

মোটকথা, উপলক্ষি ও অনুশীলনই যে-কোনো প্রকার মূল্যবোধ অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। একথা মনে রেখে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকব।

**নতুন শব্দ:** অষ্টাঙ্গ, অনুশীলনসাধ্য, ঈর্ষা, অপ্রাপ্তি।

### পাঠ ১০, ১১ ও ১২ : এইচআইভি/এইডস ও তার প্রতিকার

#### এইডস ও এইচআইভি-র ধারণা

নৈতিকতার বিপরীত প্রবৃত্তি হচ্ছে অনৈতিকতা। মানুষ যেমন ভালো কাজ করে, তেমনি মন্দ কাজেও লিপ্ত হয়। সাদার বিপরীতে যেমন কালো থাকে, তেমনি আলোর বিপরীতে থাকে অঙ্ককার। আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি অনৈতিক কাজ সম্পর্কেও ধারণা অর্জন করতে হবে। অনৈতিক কাজ সম্পর্কে জানা থাকলে আমরা তা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক হতে পারব। আমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে ধূমপান ও মাদকাসক্তির মতো অনৈতিক কাজ সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা এখন এমন একটি রোগ সম্পর্কে জানব, যার উৎস কয়েকটি অনৈতিক কাজ। রোগটির নাম এইডস।

এইডস একটি মারাত্মক রোগ। এইডস-এ আক্রান্ত হলে রোগীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ফলে রোগী নানা প্রকার রোগে ঘন-ঘন আক্রান্ত হতে থাকে। এ-রোগ এখন পর্যন্ত নিরাময়যোগ্য নয়। তাই শেষ পর্যন্ত রোগীর অকাল মৃত্যু ঘটে।

এইডস কথাটি ইংরেজি - AIDS। এর পূর্ণরূপ হলো:

A = Acquired

I = Immune

D = Deficiency

S = Syndrome

Acquired Immune Deficiency Syndrome, সংক্ষেপে AIDS (এইডস)।

এইডস রোগ হয় এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতির জীবাণু থেকে, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন ভাইরাস। ভাইরাসটির নাম এইচআইভি, ইংরেজিতে - HIV। এর পূর্ণরূপ হলো: Human Immunodeficiency Virus।

### ଏଇଡ୍ସ-ଏର କାରଣ:

- କ. ଶରୀରେ ଏଇଚାଇଭି ଭାଇରାସ ଆଛେ ଏମନ କାରଣ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଅନ୍ୟେର ଶରୀରେ ସଖାଳନ କରା ହୁଏ,  
ତାହଲେ ରଙ୍ଗ ଏହଥକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇଡ୍ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଁଯାର ବୁଁକି ଥାକେ । ଏଇଡ୍ସ-ଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ  
ଏକଜନେର ବ୍ୟବହତ ସିରିଝ ବା ସୁଇ ଯଦି ଅନ୍ୟଜନ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହଲେ ଏଇଚାଇଭି ଭାଇରାସ  
ସଂକ୍ରମଣେର ବୁଁକି ଥାକେ । ଯାରା ଇନଜେକଶନେର ମାଧ୍ୟମେ ନେଶା କରେ, ତାରା ଏତାବେ ଏଇଡ୍ସ-ଏ  
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହତେ ପାରେ । ସେହେତୁ ରଙ୍କେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଏଇଚାଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ସେହେତୁ  
ଏଇଚାଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହତ ଗ୍ରେଡ, କ୍ଷୁର, ଚାକୁ ଇତ୍ୟାଦିର ମାଧ୍ୟମେରେ ଏ ଜୀବାଗୁ ଛଡ଼ାତେ  
ପାରେ ।
- ଘ. ଏଇଡ୍ସ-ଏର ଆରଣ୍ୟ ଏକଟି କାରଣ ହଜ୍ଜେ ଯୌନମିଳନ । କେଉଁ ଯଦି ଏଇଚାଇଭି ଭାଇରାସ  
ବହନ କରିଛେ ଏମନ କାରଣ ସଙ୍ଗେ ଯୌନମିଳନ କରେ, ତାହଲେ ତାର ଏଇଡ୍ସ-ଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଁଯାର  
ସଞ୍ଚାବନା ଥାକେ ।
- ଗ. ଗର୍ଭକାଳୀନ ସମୟେ ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାୟ, ପ୍ରସବକାଳେ ଏବଂ ଜନ୍ମେର ପରେ ଏଇଡ୍ସ-ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାୟେର  
ବୁକେର ଦୁଧେର ମାଧ୍ୟମେ ଶିଖର ଶରୀରେ ଏଇଚାଇଭି ସଂକ୍ରମଣେର ସଞ୍ଚାବନା ଥାକେ ।

ତବେ ଏଇଡ୍ସ ଛୋଯାଚେ ରୋଗ ନାହିଁ । ଏଇଡ୍ସ-ଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀର ସଙ୍ଗେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧାରଣ କାଜକର୍ମ କରିଲେ  
ଏଇଡ୍ସ ହେଁଯାର କୋନୋ ସଞ୍ଚାବନା ନେଇ ।

ଏଇଡ୍ସ-ଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀର ସଙ୍ଗେ କୋଳାକୁଳି କରିଲେ, ଏକଇ ଟ୍ୟଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ, ତାର କର୍ଫ୍ ବା  
ସର୍ଦି ଥେକେ କିଂବା ତାର ଢୋଖେର ଜଳ ବା ଘାମ ଥେକେ ଏଇଚାଇଭି ସଂକ୍ରମଣେର କୋନୋ ସଞ୍ଚାବନା ନେଇ ।  
ଏଇଚାଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ରଙ୍ଗ, ଯୌନମିଳନ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାୟେର ବୁକେର ଦୁଧେର ମାଧ୍ୟମେ ।

### ଏଇଚାଇଭି/ଏଇଡ୍ସ-ଏର ପ୍ରଭାବ:

#### ୧. ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବେଳର ଓପର ପ୍ରଭାବ

- କ. ଏଇଚାଇଭି/ଏଇଡ୍ସ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ମାରାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
- ଘ. ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଥାତେ ବରାଦ୍ଦେର ଏକଟା ବଡ଼ ଅଂଶ ଆକ୍ରାନ୍ତଦେର ପେହନେ ବ୍ୟଯ କରିବାକୁ ହୁଏ ।
- ଗ. ଏକଜନ ଏଇଚାଇଭି ପଜିଟିଭ ବହନକାରୀର ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହେଁଯେ ଏଇଡ୍ସ ରୋଗ ଅନ୍ୟଦେର  
ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ପାରେ ।

## ২. অর্থনৈতিক প্রভাব

- ক. উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- খ. পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

## ৩. সামাজিক প্রভাব

- ক. অনাথ বা এতিম ও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- খ. সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়।
- গ. এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চোখে দেখে। আক্রান্ত ব্যক্তিও লজ্জায় মরমে মরে থাকে।
- ঘ. জীবনে বঞ্চনা, হতাশা, অবিশ্বাস, ভয় ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়।

### এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়:

যেসব কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হয়ে এইডস রোগের সৃষ্টি করে, সেগুলো পরিহার করতে হবে, যেমন –

১. রক্ত গ্রহণ করার সময় দেখতে হবে রক্তদাতা এইচআইভি বহন করছে কি-না।  
এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করা যাবে না।
২. অবিবাহিত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে হবে।
৩. বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই যৌনমিলন ঘটবে। অবৈধ যৌনমিলন থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে।

হিন্দুধর্মে ছাত্রজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান রয়েছে। মনুসংহিতায় পরদারগমন নামক পাপকে পঞ্চমহাপাপের অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-ধর্মে মাদকাসক্তিকে কেবল বর্জন করতেই বলেনি,

মাদকাসক্তের সংসর্গে যাওয়া বা থাকাকেও মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং হিন্দুধর্মের বিধি-বিধান তথা অনুশাসন যথাযথভাবে মেনে চললে শুধু এইডসই নয়, যে-কোনো রকম যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আমাদের দেহ তো আজ্ঞাকে বিরাজমান স্থিতির মন্দির। আমরা বাইরের মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখি। তাহলে দেহমন্দিরকে পবিত্র রাখব না কেন? আর দেহমন্দিরকে পবিত্র রাখলেই এইচআইভি/এইডস থেকে মুক্ত থাকতে পারব।

### **এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর প্রতি আচরণ:**

হিন্দুধর্ম বলে, ‘পাপকে শূণ্য কর, পাপীকে নয়।’ তাই আমরা এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মমতাময় আচরণ করব। একজন স্বাভাবিক মানুষ থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখব না। তাঁর মানবিক মর্যাদাকে খাটো করে দেখব না। কারণ আমরা জানি, এইডস সংক্রামক রোগ নয়। তাই এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিছিন্ন করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমরা একজন এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে ব্যবহার করব, যাতে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়। তিনি যেন স্বাভাবিকভাবে সকল কাজ করতে পারেন। তাঁর মন যেন প্রফুল্ল থাকে। হিন্দুধর্ম জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলেছে। এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও যেন সে-সেবা থেকে বিপ্রিত না হন।

**দলীয় কাজ:** এইডস-এ আক্রান্ত রোগীদের প্রতি করণীয় বিষয়গুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ:** নিরাময়যোগ্য, সিরিঝ, ব্রেড, ক্ষুর, গর্ভকালীন, প্রসবকালে, ছেঁয়াচে, পরদারগমন, পদ্মমহাপাপ, দেহমন্দির।

### **অনুশীলনী**

#### **শূন্যস্থান পূরণ কর:**

১. আমাদের সর্বদা ..... কথা বলা উচিত।
২. মূল্য কথাটি দ্বারা মান বা ..... বোঝায়।
৩. নেতৃত্ব মূল্যবোধ ..... অঙ্গ।
৪. প্রহাদ ..... জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
৫. সৎসঙ্গ হচ্ছে ..... সাম্মিধ্য।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পরশপাথর	ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।
২. জীবসেবা করলে	মান করেন।
৩. সাধু প্রতিদিন ভোরে	মহৎ গুণ।
৪. পরমতসহিষ্ণুতা	হিংসার বিপরীত দিক। লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করে।

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. সৎসঙ্গ বলতে কী বোঝায়?
২. অহিংসাকে পরম ধর্ম বলার কারণ বুঝিয়ে লেখ।
৩. মানবজীবনে সংযমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লেখ।
৪. নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. বর্তমান সমাজে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
২. ‘সৎসঙ্গের মাধ্যমে জীবনের চরম শিখরে আরোহণ করা সম্ভব’ – শ্রীধরের জীবনাবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
৩. ‘এইডস প্রতিরোধের জন্য চাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা’ – মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. যোগশাস্ত্রে যোগের কয়টি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে?
 

ক. চারটি	খ. ছয়টি
গ. আটটি	ঘ. দশটি
২. ‘এইডস’ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন –
  - i. ধর্মীয় অনুশাসন
  - ii. ব্যক্তিসচেতনতা
  - iii. সহনশীলতা

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| କ. i        | ଘ. i ଓ ii      |
| ଗ. ii ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼େ ୩ ଓ ୪ ନମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ:

ରବିନ ଦେଖିଲ କଯେକଟି ଛେଳେ କୌତୁଳବଶତ ଏକଟି ବିଡ଼ାଳକେ ଆସାତ କରଛେ । ବିଡ଼ାଳଟିର ଥୁବଇ ଖାରାପ ଅବହ୍ଲାସ । ସେ ଛେଳେଶ୍ଵରଙ୍କେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିଲ ଏବଂ ବିଡ଼ାଳଟିକେ ବାଡ଼ିତେ ନିଯେ ସେବା କରତେ ଲାଗଲ ।

୩. ରବିନେର ମଧ୍ୟେ କାଜ କରେଛେ -

- i. ଅହିଂସା
- ii. ନ୍ୟାୟବିଚାର
- iii. ସଂସଙ୍ଗ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| କ. i        | ଘ. i ଓ ii      |
| ଗ. ii ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

୪. ଉତ୍କ କାଜେର ମାଧ୍ୟମେ ରବିନେର ପକ୍ଷେ ସମ୍ବନ୍ଧ -

- i. ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନ
- ii. ଭାଲୋବାସା ଲାଭ
- iii. ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| କ. i        | ଘ. i ଓ ii      |
| ଗ. ii ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন:

দিনেশবাবু এলাকায় ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে ঢাকায় একটি বেসরকারি সংস্থায় ঢাকারি করে। আর ছোট ছেলে বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে সংসারের কাজকর্ম তদারকি করে। বড় ছেলে অফিসের কাজের ঝামেলায় সহজে বাড়ি যেতে পারে না। আর সেটাই দিনেশবাবুর ক্ষেত্রের কারণ। তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ-সময় তিনি তাঁর সম্পদের চার ভাগের তিনভাগ ছোট ছেলের নামে লিখে দেন।

ক. প্রহ্লাদের পুত্রের নাম কী?

খ. সৎসঙ্গকে অত্যন্ত মধুর বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. দিনেশবাবুর আচরণের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোন দিকটির বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়?

ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দিনেশবাবুর কাজটি তোমার পঠিত ‘প্রহ্লাদের ন্যায়বিচার’ উপাখ্যানের আলোকে মূল্যায়ন কর।

**সমাপ্ত**



## মন যার সংশয়ী তার বড় কষ্ট -শ্রী সারদা দেবী

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর  
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য